দেবলোকের যৌনজীবন

অতুল সুর

সূচিপত্র

দেবলোকের যৌনজীবন

গ্রীকপুরাণ থেকে দেবলোকের যৌনজীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা দিয়েই আমি আমার বই শুরু করছি। হিন্দুদের মত গ্রীকরাও তাদের দেবদেবীদের মানুষের প্রতিরূপেই কল্পনা করত। সেজন্য মনুষ্য সমাজে নারীপুরুষের আচরণে যে সব দোষ-গুণ থাকে গ্রীক দেবদেবীদের মধ্যেও আমরা তাই দেখি। মনুষ্যসমাজে পুরুষ অপরের স্ত্রীর প্রতি লালসা প্রকাশ করে বা অপরের স্ত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষণ করে বা নারী-পুরুষ অজাচার ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। গ্রীক দেবদেবীদের মধ্যেও তাই হতো।

গ্রীকদের সবচেয়ে বড়ো দুই দেবদেবী ছিল জ্যুস্ ডিমিত্রাস্। এ দুজনেই আদর্শ চরিত্রের দেবতা ছিলেন না। জ্যুস তার অনূঢ়া ভগিনী ডিমিত্রাসে উপগত হয়ে কৃষিদেবী পারসিফোনের জন্ম দিয়েছিল। আবার পড়ি নিজ দুহিতা মিরহাতে উপগত হয়ে তার পিতা অ্যাডোনিস-এর জন্ম দিয়েছিল। এই অজাচারের জন্য মিরহাকে বৃক্ষে পরিণত হতে হয়েছিল। আবার পড়ি অ্যাক্টিয়ন নামে এক পৌরানিক শিকারী আর্টেমিসকে নগ্ন অবস্থায় স্নান করতে দেখেছিল বলে সে মৃগীতে পরিণত হয়েছিল। আবার পড়ি অ্যালকিন্তু তার নিজ ভগিণী এরিট্রকে বিয়ে করেছিল। এরূপ অজাচারের অনেক দৃষ্টান্তই গ্রীকপুরাণে আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বীভৎস হচ্ছে ইডিপাসের নিজ মাতাকে বিয়ে করে তার গর্ভে চারটি সন্তান উৎপাদন করা। প্রণয়ের দেবী অ্যাফ্রোড়িটিকে আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখি এবং ওই ব্যভিচারের ফলে তার অনেকগুলি সন্তান হয়েছিল। অ্যাপোলোকে আমরা

দেখি ড্রাইওপি নামক পরীকে অপহরণ করতে। টিটিয়াসকে আমরা দেখি লিটোকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হতে। আবার দেখি সতীত্বের প্রকৃষ্ট প্রতীক হিসাবে। যদিও আর্টেমিসের সঙ্গে আটলাণ্টাকে একীকরণ করা হয়েছিল তা হলেও আটলাণ্টা কুমারী অবস্থায় মেলিয়াগারকে প্রসব করেছিল।

গ্রীক পুরাণে আরও আছে যে দেবতারা যৌনলিপ্সার বশীভূত হয়ে পৃথিবীতে আসতো মর্ত্যের মানবীদের সঙ্গে মিলিত হতে। সুতরাং এই বইয়ে হিন্দুদের দেবলোকের যৌনজীবনের যে চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সবদেশের পুরাণেই দেবতাদের এরূপ যৌনাচারের বিবরণ আছে। তবে এই বইয়ে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে মাত্র হিন্দুদের দেবলোকের যৌনাচার। সেজন্য এই বইয়ে আমরা হিন্দুদের দেবলোকের যৌনাচার নিয়েই আলোচনা করব।

॥ দুই ॥

মামুষ গোড়া থেকেই তার দেবতাকে নিজের স্বরূপে কল্পনা করে নিয়েছিল। সেজন্য মানুষের যে সব দোষ-গুণ আছে, তার দেবতাদেরও তাই ছিল। এটা বিশেষ করে লক্ষিত হয় দেবতাদের যৌনজীবনে। যৌনজীবনে মানুষের যে সব গর্হিত আচরণ আছে, দেবতাদেরও তাই ছিল। যৌনজীবনে সবচেয়ে গর্হিত আচরণ হচ্ছে ইনসেষ্ট' বা অজাচার। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে যে যৌনসংসর্গ ঘটে, তাকেই অজাচার বলা হয়। তবে যে সমাজের মধ্যে এরূপ সংসর্গ ঘটে, সেই সমাজের নীতি-বিধানের ওপরই নির্ভর করে

কোনটা অজাচার, আর কোনটা অজাচার নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কোন কোন উপজাতির মধ্যে বিধবা বিমাতা ও বিধবা শাশুড়ীকে বিবাহ করার প্রথা আছে। অন্যত্র এটা অজাচার। উত্তর ভারতে বিবাহ সপিণ্ড-বিধান ও গোত্র-প্রবর-বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেখানে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে অজাচার ঘটবার উপায় নেই। আবার দক্ষিণাত্যে মামা-ভাগ্নী ও পিসতুতো-মামাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ সামাজিক নিয়ম-কানুন দ্বারা স্বীকৃত। সেখানে এরূপ যৌনসংসর্গ অজাচার নয়। আবার প্রাচীনকালে ভ্রাতা ও ভাতৃবধুর মধ্যে যৌন-সংসর্গ অজাচার বলে গণ্য হত না। ভ্রাতা অস্বীকৃত হলে, অপরকে ডেকেও বিধবা বধূদের গর্ভসঞ্চার করানো হত। এরূপ গর্ভসঞ্চারের ফলেই মহাভারতের দুই প্রধান কুলপতি ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয়েছিল। অথর্ববেদে (৮৬৭) পিতা-পুত্রী ও ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে যৌনমিলনের উল্লেখ আছে। নহুষ তার 'পিতৃকন্যা' বিরজাকে বিবাহ করেছিল ও তার গর্ভে ছয়টি সন্তান উৎপাদন করেছিল।

॥ তিন ॥

মানুষের এরূপ যৌনাচারের প্রতিফলন আমরা দেবতাদের জীবনেও লক্ষ্য করি। মানুষের যৌনজীবনে যেমন সংযমের অভাব দেখা যায়, দেবতাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ছিল। বস্তুতঃ দেবতাদের আমরা ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কামাসক্ত, অজাচারী, বহুপত্নীক ও ব্যভিচারীরূপে দেখি। আর ইন্দ্রের দেবসভা, মর্ত্যের রাজারাজড়াদের অনুকরণেই কল্পিত হয়েছিল। সেই দেবসভার সঙ্গে আমরা পরবর্তীকালের মোগল বাদশাহদের দরবারের বা

জমিদার-তালুকদারদের বৈঠকখানা ও বাগানবাড়ীর নাচঘরের কোন প্রভেদ দেখি না। দেবসভায় আমরা যখন অপ্সরাদের নাচতে দেখি, তখন আমাদের মনে হয় তারা যেন নাচছে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের শোভাবাজারের রাজবাড়ীর হলঘরে ব। রাজ রামমোহন রায়ের মানিকতলা বাগানবাড়ীতে। বস্তুত দেবসভা মুখরিত হয়ে থাকত অঙ্গরাদের নাচগানে। নামজাদা অপ্সরাদের মধ্যে ছিল উর্বশী, মেনকা, রস্তা, তিলোত্তম, ঘৃতাচী, মুকেশী, মঞ্জুঘোষা, অলম্বুষা, বিদ্যুৎপর্ণা, সুবাহু, মুপ্রিয়া, সরসা, পঞ্জিকাস্থল ও বিশ্বাচী। নৃত্যকলায় এরা সকলেই ছিল পারদর্শিনী। তাদের সৌন্দর্য ও যৌন আবেদনের কথা সব সময়ই বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তারা ছিল স্বর্গের স্বাধীন নারী। তার মানে মর্ত্যলোকের বারযোষিতদের সঙ্গে তাদের কোন প্রভেদ ছিল না।

এবার দেবতাদের যৌনজীবনের দিকে তাকানো যাক। ঋগ্বেদে দেখি যমী তার যমজ ভ্রাতা যমের কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করছে ; দস্ত নিজ ভগিনী মায়াকে, লোভ নিজ ভগিনী নিবৃত্তিকে, ক্রোধ নিজ ভগিনী হিংসাকে ও কলি নিজ ভগিনী নিরুক্তিকে বিবাহ করছে। আবার উষা সূর্যের জনয়িত্রী। কিন্তু সূর্য প্রণয়ীর ন্যায় তার অনুগমন করছে ও তাকে স্ত্রীরূপে বরণ করছে। (পরে দেখুন)। মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী শতরূপ ব্রহ্মার কন্যা। কিন্তু ব্রহ্মা কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে অজাচারে লিপ্ত হন। এই কন্যার গর্ভে ব্রহ্মা হতে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হয়। কিন্তু অন্য মতে ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর স্ত্রী ও স্বায়ম্ভুব মনু হতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র ও কাকুতি ও প্রস্থতি নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। আবার এদের পুত্রকন্যা হতে মনুষ্য জাতির উদ্ভব হয়। তার মানে জন্ম থেকেই মনুষ্যজাতির রক্তের মধ্যে অজাচারের বীজ উপ্ত হয়েছিল।

যৌনজীবনে দেবতাদের কোনরূপ সংযম ছিল না। আদিত্যযজ্ঞে মিত্র ও বরুণ উর্বশীকে দেখে কামলালসায় অভিভূত হয়ে যজ্ঞকুম্ভের মধ্যে শুক্রপাত করে। অগ্নি একবার সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দেখে কামোন্মত্ত হয়েছিল। ঋক্ষরজাকে দেখে ইন্দ্র ও সূর্য দুজনেই এমন উত্তেজিত হয়েছিল যে ইন্দ্র তার চিকুরে ও সূর্য তার গ্রীবায় রেতঃপাত করে ফেলে। রামায়ণ অনুযায়ী সূর্যের বীর্য তার গ্রীবায় ও ইন্দ্রের বীর্য তার বালে (কেশে) পড়েছিল।

॥ চার ॥

সূর্য অজাচারী দেবতা। চন্দ্র ব্যভিচারী দেবতা। চন্দ্র দক্ষের সাতাশটি মেয়েকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু তাতেও তার কাম-লালসা পরিতৃপ্ত হয়নি। কামাসক্ত হয়ে সে দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে অপহরণ ও ধর্ষণ করে। দেবগুরু বৃহস্পতি নিজেও সাধু চরিত্রের দেবতা ছিলেন না। তিনি কামলালসায় অভিভূত হয়ে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মমতার অন্তস্বত্বা অবস্থায় বলপূর্বক তার সঙ্গে সঙ্গম করেছিলেন। আবার ঋগ্বেদে দেখি রুদ্রদেব তার নিজ কন্যা উষার সঙ্গে অজাচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। পৌরাণিক যুগে বিষ্ণুই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। কিন্তু তিনিও পরস্ত্রী বৃন্দা ও তুলসীর সতীত্ব নাশ করেছিলেন।

এই তো গেল দেবলোকের যৌনজীবনের নমুনা। আগেই সূর্যের স্ত্রী উষার কথা বলেছি। উষাকে পাবার জন্য অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র ও অশ্বিনীদ্বয় দেবগণের মধ্যে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা

হয়েছিল। এই পাঁচজন শক্তিমান দেবতা উষার পাণিপ্রার্থী হওয়ায় প্রজাপতিগণ ঘোষণা করেন যে অনন্ত আকাশপথ অনুধাবনে যিনি কৃতকার্য হবেন ও সেই সঙ্গে যত বেশী স্বরচিত বেদমুক্ত উচ্চারণ করতে পারবেন তারই হাতে উষাকে সমর্পণ করা হবে। এই পথের কথা শুনে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য আজীবন অগ্রসর হন, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বিফল হয়। তখন অশ্বিনীদ্বয় ইন্দ্রের কাছ থেকে বেদমুক্ত লাভ করে সফল হন ও উষাকে লাভ করেন। কিন্তু এরা সূর্যের অনুচর বলে উষাকে প্রতিগ্রহ করেন নি। তখন সূর্য উষাকে স্ত্রীরূপে বরণ করেন।

॥ পাঁচ ॥

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থানই সর্বাগ্রে। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে উক্ত আছে যে দেবগণ অসুরগণকে বধ করবার জন্য তাকে সৃষ্টি করেছিলেন। দেবমাতা অদিতি তার মা। আর অদিতির বোন দিতি হচ্ছে দৈত্য বা অসুরগণের মা।

ইন্দ্র অত্যন্ত সুরা (সোমরস) পায়ী। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে সোমরস পান করে ইন্দ্রের উদর স্ফীত হয়েছে। ইন্দ্র নিজ পিতার কাছ থেকেও কেড়ে নিয়ে সুরাপান করে। তার উদর হচ্ছে সোমরসের হ্রদ। তিনি একতন্ত্রী দেবতা। শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে পাছে কেউ ইন্দ্রত্ব লাভ করে, সেই ভয়ে ইন্দ্র তপস্বীদের তপস্যা ও সাধনার নানা বিঘ্ন ঘটান। এই কাজে তিনি অঙ্গরাদের নিযুক্ত করেন।

ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী বা শচী। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ অনুযায়ী ইন্দ্র তার যৌন আবেদনে আকৃষ্ট হয়ে অত্যান্ত সুন্দরীদের প্রত্যাখ্যান করে ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করেছিল। অন্য মতে ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নষ্ট করে, এবং শাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইন্দ্রাণীর পিতা পুলমাকে হত্যা করে ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করেছিল।

ইন্দ্র যে মাত্র ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নষ্ট করেছিল, তা নয়। মহাভারত অনুযায়ী ইন্দ্র গৌতম মুনির অনুপস্থিতিতে গৌতমের রূপ ধারণ করে তাঁর স্ত্রী অহল্যার সতীত্ব নাশ করেছিল। ইন্দ্র এইভাবে মর্ত্যলোকে এসে মানবীদের সঙ্গে মিলিত হত। এইভাবে বালী ও অর্জুনের জন্ম হয়েছিল। ধর্মও মর্ত্যে এসে মানবীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। ধর্মের ঔরসেই কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। অনুরূপভাবে অগ্নির ঔরসে মাহিষ্মতী নগরীর ইক্ষাকুবংশীয় রাজকন্যা সুদর্শনার গর্ভ হয়। পবনদেবও হনুমানের পিতা কেশরীরাজের স্ত্রী অঞ্জনার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। সেই পুত্রই হনুমান।

পাছে কেউ ইন্দ্রের আসন অধিকার করে, এই ভয় ইন্দ্রের সব সময়েই ছিল। রামায়ণে কথিত আছে একবার রাবণ স্বর্গে গিয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকারের জন্য ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। রাবণ-পুত্র মেঘনাদ কর্তৃক পরাজিত হয়ে ইন্দ্র লঙ্কায় নীত হয়। এ জন্যই মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ নামে সুপরিচিত। ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুক্তি দিতে অস্বীকৃত হয়। ব্রহ্মা প্রত্যাখ্যান করলে, ইন্দ্রজিৎ এমন এক রথ প্রার্থনা করে যে রথে আরোহন করে যুদ্ধযাত্রা করলে ইন্দ্রজিৎ অবধ্য হবে। অভীষ্ট বরের বিনিময়ে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে মুক্ত করেন এবং বলেন যে অহল্যার সতীত্ব নাশের জন্যই ইন্দ্রের এই দুর্গতি।

একবার ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা ও বৃত্রাসুরকে মিথ্যাচারে বধ করে শ্রান্ত ও অচেতন হয়ে জলমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছিলেন। তখন দেবতা ও মহর্ষিরা নহুষকে দেবরাজ করেন। কিন্তু কথায় বলে, যে আসে লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। ইন্দ্রত্ব লাভ করে নহুষ কামপরায়ণ ও বিলাসী হয়ে, ইন্দ্রের স্ত্রী শচীকে পাবার আকাঙ্খা করে। শচী বৃহস্পতির শরণাপন্ন হয়। তারপর কৌশল করে বৃহস্পতি স্বর্গলোক থেকে নহুষের পতন ঘটান ও শচীকে রক্ষা করেন।

ইন্দ্র যে মাত্র পরস্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করেছিল, তা নয়। সে পরনারীর গর্ভনাশও ঘটিয়েছিল। অমৃতলাভের জন্য দেবাসুরের মধ্যে যুদ্ধে দেবতারা যখন ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারে, এমন এক সন্তান প্রার্থনা করে, তখন কশ্যপ বলেন, দিতি যদি এক সহস্র বৎসর শুচি হয়ে থাকে, তবে প্রার্থিত পুত্র লাভ করবে। ৯৯০ বৎসর তপস্যা করবার পর দিতি একদিন পা না ধুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল। ইন্দ্র তাকে অশুচি জ্ঞানে তার উদরে প্রবেশ করে বজ্রদ্বারা তার গর্ভ সপ্তখণ্ড করে।

॥ ছয় ॥

এতক্ষণ দেবলোকের পুরুষদের যৌন চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। এখন দেবলোকের দেব-স্ত্রীদের কথা কিছু বলি স্বাহা দক্ষের কন্যা। ইনি অগ্নিকে কামনা করতেন। একবার সপ্তর্ষিদের যজ্ঞে অগ্নি সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দেখে কামার্ত হয়ে ওঠেন। স্বাহা এটা লক্ষ্য

করেন। স্বাহা তখন এক এক ঋষিপত্নীর রূপ ধরে ছয়বার অগ্নির সঙ্গে মিলিত হন। এবং ছয়বারই অগ্নির বীর্য কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। এই ঘটনার পর সপ্তর্ষির তাদের স্ত্রীদের সন্দেহ করে পরিত্যাগ করে। সপ্তর্ষিদের অন্যতম বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর তপঃপ্রবাহে স্বাহা আর তার নিজের রূপ ধারণ করতে পারেন নি। বিশ্বামিত্র প্রকৃত ব্যাপার জানতেন বলে তিনি ঋষি-পত্নীদের নির্দোষী বলেন। কিন্তু ঋষিরা তা বিশ্বাস করেন না। পরে স্বাহ। অগ্নির স্ত্রী হন। কিন্তু স্বর্গে গিয়েও স্বাহার স্বভাব পরিবর্তিত হয় না। তিনি নিজ স্বামীকে ছেড়ে, কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাবার জন্য তপস্যা করতে লাগলেন। বিষ্ণুর বরে স্বাহা দ্বাপরে নগ্নজিৎ রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন ও কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পান।

॥ সাত ॥

দেবতাদের মধ্যে শিবই হচ্ছেন সবচেয়ে সংযমী দেবতা। তিনি সংহারকর্তা। আবার সংহারের পর নূতন জীবনের তিনি সৃষ্টি করেন। সে জন্য তাঁর নাম শঙ্কর। সৃষ্টির রক্ষক হিসাবে তার প্রতীক লিঙ্গ বা প্রজননের চিহ্ন। এই প্রতীকের সঙ্গে যোনি বা স্ত্রীশক্তি সংযুক্ত হয়ে তিনি সর্বত্র পূজিত হন। কিন্তু তিনি মহাযোগী, সর্বত্যাগী, সন্ন্যাসী, কঠোর তপস্যা ও নিগুর্ণ ধ্যানের প্রতীক-স্বরূপ। তিনি পত্নীপরায়ণ দেবতা। সে জন্যই মেয়ের শিবের মত পতি প্রার্থনা করে। শিব প্রথম বিয়ে করেছিলেন দক্ষের মেয়ে সভ্যতাকে ভৃগুযজ্ঞে শিব শ্বশুরকে প্রণাম করেন নি বলে, দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবহীন যজ্ঞ করেন। সতী অনিমন্ত্রিতা হয়েও এই যজ্ঞে উপস্থিত হন। সেখানে সতীর কাছে দক্ষ শিবনিন্দ শুরু

করায় সতী যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। শিবের কাছে যখন এই খবর যায় তখন শিব ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের জটা ছিড়ে ফেলেন। সেই জটা থেকে বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। বীরভদ্র দক্ষালয়ে গিয়ে দক্ষযজ্ঞ নাশ করে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করে। শিব সতীর মৃতদেহ নিয়ে নৃত্য করতে শুরু করলে প্রলয়ের আশঙ্কায় বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেন।

এরপর সতী হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করে শিবকে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করে। শিবও তখন কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। শিব ও পার্বতীর মিলন করাতে এসে মদন শিবের কোপে পড়ে ভস্মীভূত হন। তারপর শিব ও পার্বতীর মিলন হলে, মদন পুনর্জীবন লাভ করেন। শিব ও পার্বতীর দাম্পত্যজীবন খুবই রমণীয়। একবার পার্বতী কৌতুক করে শিবের দুটো চোখ হাত দিয়ে চেপে ধরে। তাতে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় ও আলোর অভাবে সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। শিব তখন জগৎরক্ষার জন্য ললাটে তৃতীয় নেত্র উদ্ভব করেন। সেই থেকে শিবের তিন নেত্র। শিব কামগামী দেবতা নন, যদিও অর্বাচীন কালের সাহিত্যে শিবকে কোচপাড়ায় গিয়ে কুচনীদের সঙ্গে প্রেম করার কাহিনী রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রে শিব ব্যভিচারী দেবতা নন।

॥ আট ॥

মনুষ্যলোকে যেমন আমরা মানুষের কৌতুহল দেখি অপরের রমণক্রিয়া দেখবার, দেবতাদেরও সেরূপ কৌতুহলজনক প্রবৃত্তি ছিল। কালিদাসের কুমারসম্ভবে আমরা দেখি যে উমার সহিত মহাদেবের রমণকালে অগ্নিদেব পারাবতাকারে সেই রমণক্রিয়া দেখেছিলেন। উমাদেবী অগ্নিদেবকে দেখে লজ্জাবশতঃ রমণক্রিয় হতে নিবৃত্ত হন ও মহাদেব ক্রোধবশতঃ তার বীর্য অগ্নিদেবের প্রতি নিক্ষেপ করেন। অগ্নিদেব সে বীর্ষের তেজ সহ্য করতে না পেরে তা গঙ্গায় বিসর্জন দেন নয়।

এবার স্বর্গের এক অনুপম প্রেম কাহিনীর কথা বলব। কচ ও দেবযানীর কথা। কচ দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র। আর দেবযানী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের মেয়ে। দেবতাদের সঙ্গে নিহত অসুরদের শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে পুনজীবিত করতেন। দেবতারা এ বিদ্যা জানতেন না। দেবতারা তখন কচকে শুক্রাচার্যের সমীপস্থ হয়ে, তার প্রিয় কন্যা দেবযানীকে সন্তুষ্ট করে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করতে বলেন। কচ হাজার বছরের জন্ত শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কচ গুরু ও গুরুকন্যার সেবারত হয়ে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করতে থাকে। ঘটনাচক্রে দেবষানী রূপবান কচের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু পাচশ বৎসর অতীত হবার পর, অসুররা কচের অভিসন্ধি বুঝতে পারে। তারা, একদিন গোচারণকালে কচকে বধ করে তার মাংস কুকুরকে খাইয়ে দেয়। দেবযানীর অনুনয়ে শুক্রাচার্য র্তার সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে কচকে পুনর্জীবিত করেন। এরপর অসুররা কচকে আবার হত্যা করে। শুক্রাচার্য কচকে আবার জীবিত করেন। তৃতীয়বার অসুররা কচকে ভস্ম করে সেই ভস্ম সুরার সঙ্গে মিশিয়ে শুক্রাচার্যকে পান করতে দেন। দেবযানী পুনরায় কচের জীবন প্রার্থনা করলে শুক্রাচার্য বলেন যে কচকে পুনর্জীবিত করতে হলে

তার মৃত্যু অনিবার্য, কেননা তার উদর বিদীর্ন না করলে কচ পুনর্জীবিত হবে না। এই কথা শুনে, দেবযানী শুক্রাচার্যকে বলে, তাদের দুজনার মৃত্যুই তার কাছে শোকাবহ, এবং কারুর মৃত্যু ঘটলে তারও মৃত্যু অনিবার্য। তখন শুক্রাচার্য কচকে সঞ্জীবনী-বিদ্যা দান করে বলেন যে তুমি পুত্ররূপে আমার উদর থেকে নির্গত হয়ে আমাকে সঞ্জীবনী মন্ত্রদ্বারা পুনর্জীবিত কর। কচ শুক্রাচার্যের পেট থেকে বেরিয়ে এসে তাকে পুনর্জীবিত করে এক হাজার বৎসর উত্তীর্ণ হলে কচ স্বর্গলোকে ফিরে যেতে চায়। দেবযানী তখন তাকে প্রেম নিবেদন করে তাকে বিয়ে করতে চায়। কচ বলে, দেবযানী তার গুরুকন্তী, সেজন্য তাকে বিয়ে করা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। দেবযানী পীড়াপীড়ি করাতে কচ আবার বলে, 'শুক্রাচার্যের দেহ থেকে তোমার উৎপত্তি, আমিও শুক্রাচার্যের দেহে বাস করেছি, সুতরাং তুমি আমার ভগিনী। সেজন্য এ বিবাহ একেবারে অসম্ভব।' দেবযানী তখন রেগে গিয়ে অভিশাপ দেয় যে কচ যে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখেছে, তা ফলবতী হবে না। কচও দেবযানীকে অভিশাপ দিয়ে বলে, তোমার কামনাও সিদ্ধ হবে না। কোন ব্রাহ্মণ বা ঋষিপুত্র তোমাকে বিবাহ করবে না। তোমার অভিশাপে আমার বিদ্যা বিফল হলেও, আমি যাকে এ বিদ্যা দেব, তার এ বিদ্যা ফলবতী হবে। এই বলে কচ স্বর্গলোকে চলে যায়। এরপর রাজা যযাতির সঙ্গে দেবযানীর বিবাহ হয়। তবে সে আর এক দীর্ঘ কাহিনী। তা পরে বিবৃত করেছি।

॥ দশ ॥

শুক্র ও দেবযানীর উদ্ভব সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রাসঙ্গিক হবে। শুক্র মানে বীর্য, যা পুরুষের শিশ্নমুখ দিয়ে নির্গত হয়। দৈত্যগুরু শুক্রের এরূপ বিচিত্র নাম হল কেন ? মহাভারতের শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্ম তা যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। শুক্রাচার্যের আদি নাম ছিল দেবর্ষি উশনা। গোড়ায় তিনি দেবদ্বেষী ছিলেন না। একবার দেবগণের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য অসুররা দেবর্ষি উশনার মা ভৃগুপত্নীর আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল। দেবতারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। বিষ্ণু তখন তার চক্র দিয়ে ভৃগুপত্নীর শিরচ্ছেদন করেন। এই ঘটনার পর দেবর্ষি উশনা দেবদ্বেষী হন। একদিন তিনি যোগবলে কুবেরকে বদ্ধ করে তার সমস্ত ধন অপহরণ করেন। কুবের মহাদেবের কাছে অভিযোগ করে। মহাদেব কুবেরের অভিযোগ শুনে শূল হস্তে উশনাকে মারতে আসেন। উশনা মহাদেবের শূলের ডগায় আশ্রয় নেন। মহাদেব উশনাকে ধরে মুখে পুরে গ্রাস করে ফেলেন। তার ফলে উশনা মহাদেবের পেটের ভিতর থেকে যায়। মহাদেব মহাহ্রদের জলের মধ্যে দশ কোটি বৎসর তপস্যা করেন। পেটের ভিতর থাকার দরুন, এই তপস্যার ফল উশনাতেও অর্শায়। মহাদেব জল থেকে উঠলে, উশনা মহাদেবের পেট থেকে বেরিয়ে আসার জন্ত বারম্বার প্রার্থনা করে। মহাদেব বলে তুমি আমার শিশ্নমূখ দিয়ে নির্গত হও। মহাদেবের শিশ্নমুখ দিয়ে নির্গত হওয়ার দরুণ, তার নাম হয় শুক্র। মহাদেব শুক্রকে দেখে আবার শূল দিয়ে তাকে মারতে যান। এমন সময় ভগবতী বলেন শুক্র আমার পুত্র। তোমার পেট থেকে যে নির্গত হয়েছে, তাকে তুমি মারতে পার না।

কিন্তু কাহিনীটার শেষ এখানে নয়। হরিবংশ অনুযায়ী বিষ্ণু শুক্রের মার শিরচ্ছেদ করেছিলেন বলে শুক্রের পিতা মহর্ষি ভৃগু ক্রুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে অভিশাপ দেন যে স্ত্রীবধ-হেতু পাপের জন্য বিষ্ণুকে সাতবার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তারপর তিনি মন্ত্রবলে শুক্রজননীকে আবার জীবিত করে তোলেন। এই ঘটনার পর দেবতারা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। সবচেয়ে বেশী ভয় পান ইন্দ্র। কেননা মহাদেবের আদেশে শুক্র ব্রহ্মচারী হয়ে তপস্যা করেছিলেন এক প্রার্থিত বর পাবার জন্ত ! ইন্দ্র শুক্রের এই তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য নিজ কন্যা জয়ন্তীকে শুক্রের কাছে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘকাল তপস্যার পর শুক্র তার ইপ্সিত বর পান। এদিকে জয়ন্তীর ইচ্ছানুসেের শুক্র অদৃশ্য হয়ে থেকে জয়ন্তীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। সেই সুযোগে বৃহস্পতি শুক্রের রূপ ধরে অসুরদের মধ্যে আসেন ও অসুররা তাকে প্রকৃত শুক্র ভেবে গুরু হিসাবে সংবর্দ্ধনা করেন। অদৃশ্য অবস্থায় থাকাকালীন শুক্রের ঔরসে ও জয়ন্তীর গর্ভে দেবযানী নামে এক কন্যা হয়। শুক্র যখন ফিরে এল, অসুররা তখন তাকে চিনতে না পেরে তাড়িয়ে দেয়। তারপর যখন তারা বৃহস্পতির ছলনা বুঝতে পারল, তখন তারা শুক্রকে গ্রহণ করে তার কোপ নিবৃত্ত করল।

আগেকার দিনে দেবতারা যেমন মর্ত্যে আসতেন, মর্ত্যের লোকও স্বর্গে যেত। পরবর্তীকালের এক কাহিনী অনুযায়ী মর্তবাসিনী নেতা স্বগের ধোবানী ছিল, এবং তার সাহায্যে বেহুলা দেবসভায় গিয়েছিল। যাক, বৈদিক যুগের কথাই বলি। শতপথব্রাহ্মণ অনুযায়ী রাজা পুরুরবা একবার দেবসভায় আহুত হয়েছিলেন। দেবসভায় নৃত্যকালে পুরুরবার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকালে উর্বশীর তালভঙ্গ হয়। ফলে ইন্দ্রের

শাপে উর্বশীকে মর্ত্যে এসে বাস করতে হয়। মর্ত্যে এসে পুরুরবা ও উর্বশী পরস্পর প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। উর্বশী কয়েকটি শর্তে পুরুরবার স্ত্রীরূপে থাকতে সম্মত হয়। মহাভারতের বনপর্ব অনুযায়ী পাণ্ডুপুত্র অর্জনও দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের জন্য স্বর্গে গিয়েছিলেন এবং সেখানে পাঁচ বৎসর বাস করেছিলেন। সে সময় উর্বশী তার কাছে তার প্রেম নিবেদন করেছিল। কিন্তু অর্জুন তা প্রত্যাখান করেছিলেন। রামায়ণ অনুযায়ী রাবণও একবার স্বর্গে গিয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকারের জন্য ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। নহুষকেও দেবতারা স্বর্গে নিয়ে গিয়ে ইন্দ্রের আসনে বসিয়েছিলেন।

॥ এগার ॥

দেবলোকের যৌনজীবন সম্পর্কে উপরে যে সকল ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে, সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেবলোকের একটা কদর্য আলেখ্য অঙ্কনের উদ্দেশ্যে সেগুলোর এখানে সমাবেশ করা হয়নি। যে পরিমণ্ডলের মধ্যে এই সকল ঘটনা ঘটেছিল সেই পরিমণ্ডলকে আমরা দেবসমাজ বলে অভিহিত করতে পারি। মানুষ যখনই তার নিজ প্রতিচ্ছবিতে তার দেবতাকে কল্পনা করেছিল, তখনই সে দেবসমাজকে তার নিজ সমাজেরই ভাবমূর্তি নিয়ে কল্পনা করে নিয়েছিল। তার মানে মনুষ্যসমাজের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও আচরণ সবই দেবসমাজেও আরোপিত হয়েছিল। সেজন্য মর্ত্যের রাজসভায় বিলাসমণ্ডিত ও লাস্যময় পরিবেশের প্রতিবিম্বই ইন্দ্রের দেবসভায় দেখতে পাই। সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে তার প্রতি আসক্ত হওয়া বা চিত্তদৌর্বল্যের প্রতিঘাতে রেতস্থলন হয়ে যাওয়া, দেবলোক ও মনুষ্যলোক, এই উভয় লোকেরই কোন বিচিত্র

ব্যাপার নয়। নারীহরণ মনুষ্যসমাজে যেমন আছে, দেবসমাজেও তাই ছিল। গুরুপত্নীর সঙ্গে ব্যভিচার প্রাচীন ভারতে সচরাচর ঘটত। ধর্মশাস্ত্রকারগণ এর নাম দিয়েছিলেন গুরুতল্প। সুতরাং চন্দ্রের গুরুপত্নী তারার সঙ্গে ব্যভিচার কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আবার দ্রৌপদীর বা জানকীর বিবাহসভার প্রতিবিম্বই আমরা ইন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবতাগণের উষার পানিপ্রার্থী হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দেখি ভগিনী বিবাহ প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। তার বহু উল্লেখ আমরা জাতক কাহিনী সমূহে ও জৈন সাহিত্যে পাই। পরবর্তীকালের সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী এগুলো অবশ্য গহিত আচরণ ছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কোনো সমাজ কখনও স্থিতিশীল হয়ে একই জায়গায় অনড় অবস্থায় দাড়িয়ে থাকে না। যুগে যুগে তার রীতিনীতির পরিবর্ত ঘটে। দেবসমাজেরও এরূপ বিবর্তন ঘটেছিল। যেমন, যদিও এক সময় ভাই-বোনের মধ্যে মিলন স্বীকৃত হয়েছিল, পরবর্তীকালে আবার কচ-দেবযানীর কাহিনী থেকে জানতে পারা যায় যে এরূপ মিলন অজাচার বলেই পরিগণিত হয়েছিল। বস্তুতঃ যেটা প্রচলিত রীতি, সেটাই অনুমোদিত রীতি। সেজন্য একজন বিখ্যাত মৃতত্ত্ববিদ উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার বলছেন যে mores can set anything right। তবে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর অনেক আচরণ প্রশ্নাতীত। ইন্দ্র বৈদিক যুগের দেধরাজ, আর বিষ্ণু পৌরাণিক যুগের দেবাধিপতি। মানবীয় জগতে যেমন বলা হয় রাজার বেলায় কোন নিয়ম-কানুন খাটে না (King is above law), দেবলোকেও ইন্দ্র ও বিষ্ণু সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা চলে। তবে মানুষের হাতে অভিশপ্ত হওয়ার হাত থেকে তাদের অব্যাহতি ছিল না। গৌতম, বৃন্দা ও তুলসীর অভিশাপ তার দৃষ্টান্ত। মনুষ্যসমাজে যৌন অনাচারের জন্য যেমন অপরাধীকে

একঘরে করে দেওয়া হত, দেবসমাজেও তেমনই অপরাধীকে সমাজবহির্ভূত করে মর্ত্যে পাঠানো হত।

মনে রাখতে হবে যে মনুষ্যসমাজে কোনদিন ব্রহ্মচর্য পালন সাধারণ বিধি ছিল না। দেবসমাজেও নয়। মানুষ যখন দেবতাদের তার নিজ প্রতিচ্ছবিতে কল্পনা করেছিল, তখন দেবতাদেরও physiological e biological needs দিয়েছিল। সেজন্যে মানুষের মত দেবতারাও বিবাহ করতেন, সন্তান উৎপাদন করতেন, পরিবার গঠন করতেন, আবার ব্যভিচারও করতেন। এক কথায় যৌন জীবনচর্যায় দেবলোকের সঙ্গে মনুষ্যলোকের বিশেষ কোন বিভেদ ছিল না।

অপ্সরাদের যৌ* আবেদন

হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা । কিন্তু স্বর্গের বারযোষিতদের সংখ্যা ষাট কোটি । তেত্রিশ কোটি দেবতা, ষাট কোটি বারযোষিতদের নিয়ে কি করতেন, তা আমাদের জানা নেই ।

স্বর্গের বারযোষিতদের বলা হত অপ্সরাা । অপ্সরাারা অপূর্ব লাবন্যময়ী হত । নৃত্যকলায় তারা হত পটীয়সী । তারা সবসময়েই তাদের নৃত্যদ্বারা ইন্দ্রের দেবসভা মাতিয়ে রাখত। ইন্দ্র অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেবতা ছিলেন । দেবলোক বা নরলোকে আর কেউ কঠোর তপস্যায় রত থেকে ইন্দ্রত্ব পাবার চেষ্টা করছে দেখলে, ইন্দ্র প্রায়ই অপ্সরাাদের নিযুক্ত করতেন তাদের তপোভঙ্গের জন্য ।

অপ্সরাাদের মধ্যে সর্বোত্তম অপ্সরাা ছিল উর্বশী। ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে কথাসরিৎসাগর পর্যন্ত, নানা প্রাচীন গ্রন্থে আমরা উর্বশীর কথা পাই । এসব গ্রন্থে উর্বশীর উদ্ভব সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী লিখিত আছে। পদ্মপুরাণে বিবৃত হয়েছে যে একসময় বিষ্ণু ধর্মপুত্র হয়ে ঘোরতর তপস্যায় রত হন। ইন্দ্র ভয় পেয়ে তাঁর তপোভঙ্গ করবার জন্য কামদেব ও অপ্সরাদের পাঠান। কিন্তু অপ্সরাাগণ বিষ্ণুর তপোভঙ্গ করতে অসমর্থ হয়। তখন ইন্দ্র নিজ উরু থেকে উর্বশীকে সৃষ্টি করেন। আবার শ্রীমদভাগবত অনুযায়ী বিষ্ণু তপস্যায় রত হলে ইন্দ্র কামদেব ও অপ্সরাাগণকে তাঁর তপোভঙ্গের জন্য পাঠান । তারা বিষ্ণুর তপোভঙ্গ করতে না পারলে, নরনারায়ণ দেবতাগণকে বহু লাবন্যময়ী রমণী

দেখিয়ে তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করতে বলেন । দেবতারা উর্বশীকে নির্বাচন করে । তাতেই উর্বশী শ্রেষ্ঠ অপ্সরাা বলে গণ্য হয়। আবার অন্য কাহিনী অনুযায়ী উর্বশী ইন্দ্রের উরু থেকে উদ্ভূত হয়নি, অথপ্সরাদের উরু থেকে। এরূপ কাহিনীও আছে যে উর্বশী নারায়ণের উরু ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করে । আবার অন্যান্য পুরাণের মতে উর্বশী সমুদ্রমন্থনের সময় উদ্ভূত হয়েছিল । সাতজন মনু উর্বশীকে সৃষ্টি করেছিল, এ কথাও কোনও কোনও পুরাণে আছে ।

উর্বশী সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আছে । তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কাহিনী হচ্ছে পুরুরবার সঙ্গে উর্বশীর মিলন । পুরুরবা হচ্ছে বুধের পুত্র চন্দ্রের পৌত্র। বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে চন্দ্র একবার হরণ করেছিল । তারার গর্ভে চন্দ্রের এক পুত্র হয়। এই পুত্রের নাম বুধ । বুধ বৈবস্বত মনুর মেয়ে ইলাকে বিবাহ করে । ইলার গর্ভে বুধের যে পুত্র হয় তারই নাম পুরুরবা ।

।। দুই ।।

পুরুরবা ও উর্বশীর মিলনের সবচেয়ে প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের সংবাদসুক্তে (১০।১৫) । সেখানে যে আখ্যান আছে, সে আখ্যান অনুযায়ী উর্বশী চার বছর পুরুরবার সঙ্গে ছিলেন, এবং গর্ভবতী হবার পর তিনি অন্তর্হিতা হন। ঋগ্বেদের সংবাদসুক্তে (১০|১৫) উল্লিখিত এক অস্পষ্ট আভাষ থেকে আমরা জানতে পারি যে

পূর্বজন্মে উর্বশী ছিল ঊষা ও পুরুরবা সূর্য । যে যাই হোক সংবাদসুক্তে আমরা দেখি যে পুরুরবা উর্বশীকে অনুনয় বিনয় করছে ফিরে আসবার জন্য । আর উর্বশী তা প্রত্যাখান করছে। উর্বশী বলছে–‘হে নির্বোধ ! ঘরে ফিরে যাও । আমাকে আর পাবে না– স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয়, আর বৃকের হৃদয় দুই এক প্রকার ।’

ঋগ্বেদের সংবাদসুক্তের সংক্ষিপ্ত আখ্যানটাকে বিস্তৃততর রূপ দেওয়া হয়েছে শতপথব্রাহ্মণে (১১।৫।১) । এখানে বৃহৎদেবতার একটা কথার উল্লেখ করা যেতে পারে । সেখানে বলা হয়েছে যে মিত্র ও বরুণ উর্বশীকে কামনা করেন। উর্বশীর প্রত্যাখানে তারা অভিশাপ দেন যে উর্বশী মনুষ্যভোগ্য হবেন । সেইজন্যই উর্বশীর সঙ্গে রাজা পুরুরবার মিলন ঘটেছিল । শতপথব্রাহ্মণের কাহিনী অনুযায়ী উর্বশী কয়েকটি শর্তে পুরুরবার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করতে রাজী হন । এই শর্তগুলি হচ্ছে—(১) উর্বশী যেন কোনদিন পুরুরবাকে বিবস্ত্র না দেখেন, (২) উর্বশীর শয্যার পাশে পুত্রবৎ প্রিয় দুটি মেষ বাধা থাকবে এবং এরা কখনও অপহৃত হবে না, (৩) উর্বশী একসন্ধ্যা ঘৃতমাত্র আহার করবেন । অন্য কাহিনী অনুযায়ী আরও একটা শর্ত ছিল । সেটা হচ্ছে-উর্বশী কামাতুরা না হলে, মৈথুনকর্ম সংগত হবে না। শতপথব্রাহ্মণ অনুযায়ী পুরুরবা শর্তগুলি পালন করতে সন্মত হন। অতঃপর পুরুরবা ও উর্বশী পরম সুখে বহু বৎসর একত্রে বাস করেন । কিন্তু দেবলোকে উর্বশীর অনুপস্থিতে গন্ধর্বরা ব্যথিত হয়ে ওঠে । গন্ধর্বরা তখন উর্বশীকে দেবলোকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে । পুরুরবার সঙ্গে উর্বশীর বসবাসের শর্তগুলি তারা জানত। সুতরাং কৌশল করে তার শর্তগুলি ভাঙাবার উপায় উদ্ভাবন করে। একদিন রাত্রিকালে গন্ধর্ব বিশ্বাবসু, উর্বশীর মেষদুটিকে হরণ করে। উর্বশী

চিৎকার করে ওঠে ও কাঁদিতে কাঁদিতে পুরুরবাকে মেষ দুটি উদ্ধার করবার জন্য অনুরোধ করে । পুরুরবা নগ্ন অবস্থাতেই শয্যা হতে উঠে ক্ষিপ্রগতিতে বিশ্বাবসুর পশ্চাদ্ধাবন করে । এই সময় দেবতারা বজপাতের সূচনা করে বিদ্যুতের সৃষ্টি করে। বিদ্যুতের আলোকে উর্বশী পুরুরবাকে নগ্ন দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে ত্যাগ করে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পুরুরবা তখন উর্বশীর সন্ধানে দেশবিদেশে ভ্রমণ করতে থাকে। একদিন কুরুক্ষেত্রের কাছে এক সরোবরে পুরুরবা চারজন অপ্সরাার সঙ্গে উর্বশীকে স্নান করতে দেখে । পুরুরবা তাকে ফিরে আসতে অনুরোধ করে। উর্বশী বলে-'আমি তোমার সহবাসে গর্ভবতী হয়েছি। তুমি এক বছর পর আমার সঙ্গে দেখা করলে, আমি তোমাকে আমার প্রথম সন্তান উপহার দিব এবং মাত্র একরাত্রি তোমার সঙ্গে বাস করব ।' এভাবে দীর্ঘ ছয় বছর কাল এক রাত্রির জন্য উর্বশী ও পুরুরবার মিলন ঘটে। তার ফলে আয়ু, বিশ্বায়ু, শতায়ু প্রভৃতি নামে তাদের ছয়টি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । তারপর উর্বশী পুরুরবাকে জানান যে গন্ধর্বরা পুরুরবাকে যে কোন প্রার্থিত বর দিতে প্রস্তুত আছে । পুরুরবা তখন বলেন যে উর্বশীর সঙ্গে তিনি চিরজীবন বাস করতে চান এবং এটাই তার একমাত্র প্রার্থনা । তখন গন্ধর্বরা অগ্নিপূর্ণ একপাত্র পুরুরবার সামনে রাখে এবং বলে যে – 'এই অগ্নিপাত্র গ্রহণ করে বেদের নির্দেশানুযায়ী এই অগ্নিকে তিনভাগে ভাগ কর । তারপর উর্বশীতে মনসংযোগ করে আহুতি দাও । তবেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে ।' পুরুরবা সেই অনুযায়ী কার্য করলে গন্ধর্বলোকে স্থান পান এবং উর্বশীর চিরসঙ্গী ও

চিরপ্রেমিক হয়ে সেখানে বাস করতে থাকেন (শতপথব্রাহ্মণ ৩।৪।১।১১)। উর্বশীর গর্ভে মোট ছয় সন্তান হয়- আয়ু, বিশ্বায়ু, অমাবসু, বলায়ু দৃঢ়ায়ু ও শতায়ু ।

।। তিন ॥

পুরুরবার সঙ্গে উর্বশীর মিলন সম্বন্ধে বেদে আরও এক কাহিনী আছে । একবার আদিত্যযজ্ঞে মিত্র ও বরুণ নিমন্ত্রিত হয়েছিল । সেখানে অপ্সরাা উর্বশীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ায় তাদের রেতঃপাত হয় । রেতের যে ভাগ কুম্ভে পড়ে, তা থেকে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য জন্ম গ্রহণ করে । তাতে এই দুই দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে উর্বশীকে অভিশাপ দেয় যে তাকে মর্ত্যে নির্বাসিত হতে হবে । সেই কারণেই মর্ত্যে এসে উর্বশী পুরুরবার স্ত্রী হয় ।

উর্বশী সম্বন্ধে আরও আখ্যান প্রাচীন গ্রন্থে আছে। মহাভারতের বনপর্ব অনুযায়ী মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে অর্জুন যখন দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের জন্য দেবলোকে গিয়ে পাঁচ বৎসর বাস করেছিলেন, তখন তিনি ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে নৃত্য-গীত-বাদ্য শিখছিলেন । একদিন

চিত্রসেন উর্বশীর কাছে গিয়ে বলল–‘কল্যাণী দেবরাজের আদেশে তাোমাকে জানাচ্ছি যে অর্জুন তোমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন । তিনি আজ তোমার কাছে আসবেন।’ – উর্বশী নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করে বলল, ‘আমিও তার প্রতি অনুরক্ত । সখা তুমি যাও, আমি

অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হব।' তারপর রাত্রিকালে উর্বশী অর্জুনের গৃহে যান । তার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে উর্বশী বলে—'তুমি যখন দেবালোকে আস, তখন তোমার আগমনের জন্য ইন্দ্র যে আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করেছিলেন, সে সময় তুমি নাকি অনিমেষনয়নে শুধু আমাকেই দেখেছিলে ।' তাই দেখে ইন্দ্র চিত্রসেনকে আদেশ দিয়েছিলেন আমি যেন তোমার সঙ্গে মিলিত হই । আমিও তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনঙ্গের বশবর্তী হয়ে তোমার কাছে এসেছি ।' সে কথা শুনে অর্জুন কান ঢেকে উর্বশীকে বলে—'ভাগ্যবতী, আপনার কথা আমার শ্রবণযোগ্য নয়, কেননা কুন্তী ও শচীর ন্যায় আপনি আমার গুরুপত্নী তুল্য। আপনি পুরুবংশের জননী (পুরুরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভে আয়ু জন্মগ্রহণ করে, তারই প্রপৌত্র পুরু), গুরুর অপেক্ষাও গুরুতম, সেজন্যই উৎফুল্লনয়নে আপনাকে দেখেছিলাম ।' তখন উর্বশী বলল, 'আমাকে গুরুস্থানীয়া মনে করা অনুচিৎ, কেননা অপ্সরারা নিয়মাধীন নয়। পুরুবংশের পুত্র বা পৌত্র যে কেউ স্বর্গে এলে আমার সঙ্গে মিলিত হয়। তুমিও আমার বাঞ্ছা পূর্ণ কর।' অর্জুন কর্তৃক প্রত্যাখাতা হয়ে উর্বশী ক্রোধে অভিভূত হয়ে অর্জুনকে অভিশাপ দেয় — 'আমি ইন্দ্রের অনুজ্ঞায় স্বয়ং তোমার গৃহে কামার্ত হয়ে এসেছি, তথাপি তুমি আমাকে গ্রহণ করলে না, তুমি সম্মানহীন নপুংসক নর্তকী হয়ে স্ত্রীদের মধ্যে বিচরণ করবে।' এই বলে উর্বশী নিজ গৃহে চলে যায়। এই অভিশাপের জন্যই অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাট রাজার গৃহে অর্জুনকে বৃহন্নলা নামে নর্তকীর ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকতে হয়েছিল ।

আবার মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বিশী' নাটকে আছে যে একবার কেশী দৈত্য উর্বশীকে হরণ করলে পুরুরবা তার হাত থেকে উর্বশীকে উদ্ধার করেছিল এবং উভয়ে

পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হয় । স্বর্গে অভিনয়কালে ভুলক্রমে পুরুরবার নাম উল্লেখ করে ফেলায় শাপগ্রস্ত হয়ে উর্বশী মর্ত্যে পুরুরবার স্ত্রী হয়। পুত্র মুখ দর্শনের শাপমোচন হয় । পরে নারদের বরে উর্বশী ও পুরুরবার মিলন চিরস্থায়ী হয়।

একবার অভিশপ্ত হয়ে উর্বশী ঘোটকী হয়েছিল। তখন রাজা দণ্ডী তাকে গ্রহণ করেছিল ।

।। চার ।।

উর্বশী ছাড়া আরও অপ্সরা ছিল। আগেই বলেছি যে দেবলোকের বারযোষিতদের সংখ্যা ৬০ কোটি বলে উল্লিখিত হয়েছে । তাদের মধ্যে উল্লেখনীয় হচ্ছে মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, সুকেশী, মঞ্জুঘোষা, অলম্বুষা, বিদ্যুৎপর্না, সুপ্রিয়া, সরসা, পঞ্জিকাস্থলা, বিশ্বাচী প্রভৃতি। বিভিন্ন পুরাণে এদের সৌন্দর্য ও নৃত্যগীত পারদর্শিতার অনেক উল্লেখ আছে। রম্ভা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরা ক্ষীরোদসাগর মন্থনের সময়ে উদ্ভূত হয়। একবার রম্ভা কুবেরের পুত্র নলকুবেরের নিকট অভিসার গমনকালে, রাবণ তাকে দেখে কামমুগ্ধ হয় ও বলপূর্বক তাকে ধর্ষণ করে । ধর্ষণের প্রাক্কালে রাবণের উক্তি থেকে আমরা রম্ভার রূপলাবণ্যের পরিচয় পাই । রাবণ বলেছিল—"স্বর্ণকুম্ভ পীনৌ শুভৌ ভীরু নিরন্তরৌ । কস্যেরঃ স্থলসংস্পর্শং যস্যেতস্তে কুচাবিমৌ।। সুবর্ণচক্র প্রতিমং স্বর্ণদামচিতং পৃথু। অধ্যারোক্ষ্যতি কস্তেইদ্য জঘনং স্বর্গরূপিণম ||' (রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৩১।২৩-২৪) । 'তোমার সুন্দর কুচযুগল স্বর্ণকুম্ভসদৃশ পীন, নিরন্তর (কুচদ্বয় মধ্যে কোন ব্যবধান নেই)

; তোমার কুচযুগল কোন পুরুষের বক্ষ স্পর্শ করবে ? তোমার জঘনদ্বয় সুবর্ণচক্র প্রতিম, স্বর্ণহারশোভিত স্থূল ; তোমার এই স্বর্গরূপী শ্রোণিতটে কোন পুরুষ অদ্য আরোহন করবে।' 'আমি ধর্মানুসারে আপনার পুত্রবধু', এই কথা বলে রম্ভা রাবণকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাবণ রম্ভাকে শিলাতলে ফেলে উপভোগ করল। রম্ভা রতিশ্রমে কাতরা ও ব্যাকুলা, বেপমানা ও ভীতিগ্রস্তা হয়ে নলকুবেরকে একথা জানালে নলকুবের রাবণকে অভিশাপ দেন যে রাবণ যদি কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তার প্রতি বলপ্রয়োগ করে, তাহলে রাবণের মস্তক সপ্তখণ্ডে ভগ্ন হবে । এই জন্যই সীতা রাবণ কর্তৃক, অপহৃত হয়েও নিজের সতীত্ব রক্ষা করেন । রামায়ণের আদিকাণ্ডে ও মহাভারতের অনুশাসন পর্বে রম্ভা সম্বন্ধে আর এক কাহিনী আছে । একবার ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করবার জন্য অপ্সরা রম্ভাকে পাঠান । কিন্তু বিশ্বামিস্ত্রের শাপে রম্ভা শিলাতে পরিণত হয়ে ১০০ বৎসর অবস্থান করে । স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী রম্ভা যখন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে শিলারূপে বাস করছিল, তখন অঙ্গারিকা নামে এক রাক্ষসী সেখানে উপদ্রব্য করতে আরম্ভ করে । তখন ওই আশ্রমে তপস্যারত শ্বেতমুনি বায়ব্য অস্ত্রে ওই শিলাখণ্ড যোজনা করে রাক্ষসীর দিকে নিক্ষেপ করে । অস্ত্রভয়ে ভীত রাক্ষসী পলায়ন করে কপিতীর্থে এলে তার মস্তকে ওই শিক্ষাখণ্ড পড়ে ও তার মৃত্যু হয়। ওই শিলাখণ্ড কপিতীর্থে নিমগ্ন হলে রম্ভা আবার নিজরূপ ফিরে পায়। স্কন্দপুরাণে রম্ভা সম্বন্ধে আরও দু'টা কাহিনী আছে। একটা কাহিনী অনুযায়ী একবার ইন্দ্রসভায় নৃত্যুকালে রম্ভার তালভঙ্গ হয়। তখন ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের শাপে স্পন্দনহীন বিকলাঙ্গ হয়ে রম্ভা ভূতলে পতিত হয়। পরে নারদের পরামর্শে রম্ভা শিবের পূজা করে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যেতে পারে। অপর কাহিনী অনুযায়ী ইন্দ্রের আদেশে রম্ভা জাবালি মুনির তপোভঙ্গ করে । মুনির

ঔরসে রম্ভার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জাবালি ওই কন্যাকে প্রতিপালন করেন । ওই কন্যার নাম ফলবতী ।

পূর্বকালে ঋষি বিশ্বামিত্রকে ঘোর তপস্যারত দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে তার তপস্যাভঙ্গের জন্য অপ্সরা মেনকাকে প্রেরণ করেন। সর্বাঙ্গসুন্দরী বিবস্ত্রা মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র মেনকার সহিত মিলিত হয় । এই মিলনের ফলে বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও অপ্সরা মেনকার গর্ভে কন্যা শকুন্তলার জন্ম হয়। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র অপ্সরা মেনকাকে বিদায় দিয়ে আবার তপস্যায় রত হন । তখন মেনকা সদ্যজাতা কন্যাকে বনমধ্যে মালিনী নদীর তীরে পরিত্যাগ করে ইন্দ্রসভায় প্রস্থান করেন। এই পরিত্যক্ত কন্যা শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী কর্তৃক রক্ষিত হয় ও মহর্ষি কন্বের দৃষ্টিপথে পতিত হয় । মহর্ষি কন্ব নিজের আশ্রমে এনে একে নিজ কন্যার ন্যায় পালন করতে থাকেন। শকুন্ত কর্তৃক রক্ষিত বলে কন্যাটির নাম হয় শকুন্তলা । গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসেও অপ্সরা মেনকার গর্ভে প্রমদ্বারা নামে এক কন্যা হয় । জন্মের পর মেনকা প্রমদ্বারাকে পরিত্যাগ করলে মহর্ষি স্থূলকেশ্ তাকে নিজ আশ্রমে এনে পালন করেন। রুরু মুনির সঙ্গে তার বিবাহ হয়।

ইন্দ্র সব সময়েই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন, পাছে কেউ কঠোর তপস্যা করে তাঁর ইন্দ্রত্ব কেড়ে নেয় । সেজন্য ইন্দ্র স্বর্গের বারযোষিতদের নিযুক্ত করতেন তাদের তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য। একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এখানে তোলা যেতে পারে । স্বর্গের এসব বারযোষিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুন্দরী ছিল কে ? মনে হয় তিলোত্তমাই সবচেয়ে

বেশী সুন্দরী ছিল । সেটা তিলোত্তমার উৎপত্তি থেকে আমরা জানতে পারি । এ সম্বন্ধে উপাখ্যানটি এখানে বিবৃত করা যেতে পারে । একবার দৈত্যরাজ নিষ্কুম্ভের দুই পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করে ত্রিলোক বিজয়ের জন্য অমরত্ব প্রার্থনা করে । কিন্তু ব্রহ্মা তাদের অমরত্বের বর না দিয়ে বলেন যে ত্রিলোকের কোন প্রাণীর হাতে তাদের মৃত্যু হবে না। যদি কখনও তাদের মৃত্যু হয় তবে পরস্পরের হাতে হবে । এই বর পাবার পর তারা আবার দেবতাদের পীড়ন করতে থাকে, তখন দেবতারা ব্রহ্মার কাছে যায়। ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে এক পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্টি করতে বলেন । ত্রিভুবনের সমস্ত উত্তম জিনিস তিল তিল করে সংগ্রহ করে বিশ্বকর্মা এক অতুলনীয় সুন্দরী নারী সৃষ্টি করে। এই কারণেই তার নাম হয় তিলোত্তমা । সৃষ্টির পর তিলোত্তমা দেবতাদের প্রদক্ষিণ করে । তাকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চারদিকে চারটি মুখ সৃষ্টি হয় ও ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু হয় । তাকে সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলুব্ধ করবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় । তিলোত্তমা তাদের সামনে গিয়ে নৃত্য করতে থাকে । সুন্দ ও উপসুন্দ তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাবার জন্য পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই যুদ্ধেই তারা পরস্পরের হাতে নিহত হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী তিলোত্তমা একবার দুর্বাশা মুনির ধ্যান ভঙ্গ করতে গেলে দুর্বাশার শাপে বাণের কন্যা ঊষারূপে জন্মগ্রহণ করে ।

অপ্সরা ঘৃতাচী, দু’দুজন ঋষিকে কাৎ করেছিলেন । তার মধ্যে একজন হচ্ছেন ভরদ্বাজ ঋষি। মহাভারতের আদিপর্ব অনুযায়ী ওই ঋষি গঙ্গোত্তরী প্রদেশে বাস করতেন। একদিন স্নানরতা অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখে তার রেতস্খলন হয়। ওই বীর্য তিনি কলসের মধ্যে রাখেন এবং তা থেকে কৌরবদের শিক্ষাগুরু দ্রোণের জন্ম হয়। ভাগবত ও

বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী বশিষ্ঠের ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে কপিঞ্জলের জন্ম হয় । চ্যবন ও সুকন্যার পুত্র প্রমতির ঔরসেও ঘৃতাচীর গর্ভে রুরু নামে এক পুত্র হয় । (আগে মেনকা দেখুন)। রামায়ণের আদিকাণ্ড অনুযায়ী রাজর্ষি কুশানাভ ও ঘৃতাচীর গর্ভে একশত পরম রূপবতী কন্যা উৎপাদন করেছিলেন। বর্গাও একজন অপ্সরা । একদিন চার সহচরীর সঙ্গে তিনি ইন্দ্রসভা থেকে ফিরছিলেন। পথে এক তপস্যারত ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাদের দেখা হয় । তারা এই ব্রাহ্মণের তপোভঙ্গ করবার জন্য তাকে প্রলুব্ধ করতে থাকে। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যেন শতবর্ষ তারা কুম্ভীর হয়ে জলে বাস করে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ব্রাহ্মণ প্রশমিত হয়ে বলেন, যদি কোন পুরুষ তাদের জলমধ্য থেকে তোলেন, তবেই তারা তাদের পূর্ব রূপ ফিরে পাবে। অর্জুন একসময় তীর্থভ্রমণ করতে এসে শোনেন যে ওই তীর্থে পাঁচটি কুম্ভীর বাস করে এবং তারা মানুষকে জলের মধ্যে টেনে নেয় । জলের মধ্যে অর্জুনের পা আঁকড়ে ধরলে, অর্জুন সবলে তাকে তুলে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে সে সুন্দরী নারীরূপ পায় । সেই অপ্সরা বর্গা ওইভাবে অর্জুন তার সহচরীদেরও উদ্ধার করে । এ কাহিনীটা মহাভারতের আদিপর্বে আছে।

আর একজন অপ্সরাা পঞ্জিকাস্থলা । পঞ্জিকাস্থলা পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট অপ্সরাদের অন্যতম । ইন্দ্র একবার মার্কণ্ডেয় মুনির তপোভঙ্গের জন্য পঞ্জিকাস্থলাকে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু পঞ্জিকাস্থলাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল । একবার পঞ্জিকাস্থলা যখন ব্রহ্মার কাছে যাচ্ছিল, তখন রাবণ তাকে বিবসনা করেছিল । ব্রহ্মা একথা শুনে রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বলপ্রয়োগ করলে তার মস্তক

শতধা চুর্ণ হবে। এই অপ্সরাাই বানররাজ কেশরীর স্ত্রী অঞ্জনা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । পবনদেব এর গর্ভে হনুমানকে উৎপাদন করেছিলেন ।

স্বর্গের আর একজন অগ্রসর হচ্ছে পূর্বাচিত্তী । একবার জম্বুদ্বীপের রাজা প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠপুত্র অগ্নিধ্রের কোন পুত্র না হওয়ায়, তিনি পুত্রকামনায় মন্দার পর্বতে ব্রহ্মার তপস্যায় রত হন। ব্রহ্মা তার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে পূর্বাচিত্তী নামে অপ্সরাাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। পূর্বচিত্তীর রূপে মুগ্ধ হয়ে অগ্নিধ্র তাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করে । এই বিবাহের ফলে অগ্নিধ্রের ঔরসে ও পূর্বাচিত্তীর গর্ভে নয়টি পুত্রসন্তান হয় ।

আরও একজন অপ্সরা হচ্ছে প্রম্লোচ্চা । কণ্ডু মুনির তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য ইন্দ্র প্রম্লোচ্চাকে কণ্ডুমুনির কাছে পাঠিয়ে দেন। কণ্ডু প্রণয়াসক্ত হয়ে প্রম্লোচ্চার সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করেন। তাঁর ঔরসে প্রম্লোচ্চার এক কন্যা সন্তান হয়, তার নাম মারিষা । বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী মারিষার গর্ভে প্রজাপতি দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন । বরুণ পুত্র পুষ্করের ঔরসে ও প্রম্লোচ্চার গর্ভে মনোরমা নামে এক কন্যা হয় । প্রম্লোচ্চার অনুরোধে প্রজাপতি রুচি এঁকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন। রুচির ঔরসে এঁর গর্ভে রৌচ্যমনুর জন্ম হয় । হেমা নামে আর একজন অপ্সরা ময়দানবকে বিবাহ করে। তাঁর গর্ভে মায়াবী ও দুন্দুভী নামে দুই পুত্র ও মন্দোদরী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, মন্দোদরী রাবণের স্ত্রী ও মেঘনাদের মাতা ।

অগণিত অপসারদের মধ্যে সকলের নাম আমাদের জানা নেই । যাদের নাম জানা আছে, তাদের কথাই আগে বললাম । তবে অদ্রিকা নামে আর একজন অপ্সরাার নাম আমরা মহাভারতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম বৃত্তান্তের কাহিনীর মধ্যে পাই । কুরুরাজ চেদিবংশীয় উপরিচর বসু একবার মৃগয়া করতে গিয়ে তঁর রূপবতী স্ত্রী গিরিকাকে স্মরণ করে কামাতুর হয়ে পড়েন। তাতে তাঁর রেতঃস্বলন হয় । স্খলিত শুক্র তিনি এক শ্যেনপক্ষীর সাহায্যে তঁর স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন । পথে অন্য এক শ্যেনের আক্রমনে উক্ত শুক্র যমুনার জলে পড়ে। সে সময় অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপ ধারণ করে যমুনার জলে বাস করছিল । সেই অপ্সরাা ওই শুক্র গ্রহণ করে গর্ভবতী হয়। তার ফলে তার এক পুত্র ও কন্যা হয়। কন্যা এক ধীবর কর্তৃক পালিত হয় । তার গায়ে মৎস্যের গন্ধ থাকার দরুন তার নাম মৎস্যগন্ধা হয় । তাঁর অপর নাম সত্যবতী। কুমারী অবস্থায় পরাশর মুনির ঔরসে তাঁর গর্ভে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম হয় ।

।। পাঁচ ॥

অপ্সরাাদের সঙ্গে যৌ*সম্পর্ক ছিল গন্ধর্বদের । বৈদিকযুগে গন্ধর্বরা ছিল এক শ্রেণীর উপদেবতা । কিন্তু যখন তাদের সংখ্যা বেড়ে গেল, স্বর্গেই তারা নিম্নশ্রেণীর দেবতা হিসাবে স্থান পেল । সঙ্গীতবিদ্যায় তারা বিশেষ পারদর্শী ছিল। এছাড়া, ওষধি বিষয়েও তারা অভিজ্ঞ ছিল । সেজন্য তাদের স্বর্গের বৈদ্য বলা হত । স্বর্গে তারা অপ্সরাাদের সঙ্গে গায়ক হিসাবে যোগদান করত । অপ্সরাদের সঙ্গে তারা অবাধে মেলামেশা করত। নারী

ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে যে বিবাহ হয়, তাকেই গান্ধর্ব বিবাহ বলা হত। বিষ্ণুপুরাণ মতে ব্রহ্মার কান্তি থেকে তাদের জন্ম হয় । আর হরিবংশ মতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে অবিষ্ঠার গর্ভে গন্ধর্বরা জন্মগ্রহণ করে । তাদের সমৃদ্ধশালী নগরী ও প্রাসাদ ছিল । এই সকল নগরীর অধিপতি ছিল হা হা, হু হু, চিত্ররথ, হংস, বিশ্ববায়ু, সোমারা, তুম্বুরু, নন্দি প্রভৃতি গন্ধর্বগণ ।

দেবদেবীদের ব্যভিচার

আগেই বলা হয়েছে যে দেবসমাজের পরিমণ্ডলটা মানুষ তার নিজ সমাজের প্রতিচ্ছবিতেই কল্পনা করেছিল । সেজন্য মনুষ্যসমাজে যেমন অজাচার ও ব্যভিচারের প্রচলন ছিল, দেবসমাজেও তাই ছিল । পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন দেবতা সব দেবতার উচ্চে স্থান পেয়েছিল। বেদে কিংবা ব্রাহ্মণে কিন্তু ব্রহ্মার নাম পাওয়া যায় না। পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মাই ছিলেন সৃষ্টি কর্তা । বেদে ও ব্রাহ্মণে সৃষ্টিকর্তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে। তা থেকে মনে হয় ব্রহ্মা ছিলেন বৈদিক যুগের প্রজাপতিরই পরবর্তীকালের রূপ। পুরাণে সরস্বতীকে ব্রহ্মার স্ত্রী বলা হয়েছে। শতরূপ ব্রহ্মার কন্যা । কিন্তু ব্রহ্মা নিজ কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে অজাচারে লিপ্ত হন । এই অজাচারের ফলে শতরূপার গর্ভে স্বায়ভুব মনুর জন্ম হয়। অন্য কাহিনী অনুযায়ী শতরূপ ব্রহ্মার স্ত্রী, মনুর মাতা নন । আর এক কাহিনী অনুযায়ী ব্রহ্মা নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত করেন-নর ও নারী । এদের সঙ্গমের ফলে মনুর জন্ম হয় । আর নারীকে সাবিত্রী বলা হয় । পুরাণে আছে ব্রহ্মা প্রথম নয়জন মানসপুত্র সৃষ্টি করেন । তারপর এক কন্যা সৃষ্টি করেন । এই কন্যারই নাম শতরূপা । শতরূপ। নানা নামে পরিচিত – শতরূপা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রাহ্মণী । ব্রহ্মা এই কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে একেই বিবাহ করেন। এই কন্যারই গর্ভ হতে স্বায়ভুব মনুর জন্ম হয়। আবার বলা হয়েছে স্বায়ম্ভূব মনু হতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুইপুত্র ও কাকুতি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে । তাদের পুত্রকন্যা থেকেই মনুষ্যজাতির উদ্ভব

হয় । বিভিন্ন কাহিনীগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অজাচারের মধ্য দিয়েই মনুষ্য সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল । মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও ব্রহ্মাকে কামুক দেবতা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। সেখানে ব্রহ্মা গোপকন্যার গায়ে গা লাগিয়ে উপবিষ্ট হয়ে আছেন।

যদিও বেদে এসব কাহিনী নেই, তা হলেও বেদে অজাচারের একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। প্রথমেই ঊষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঋগ্বেদের কুড়িটা সুক্তে ঊষা স্তুত হয়েছেন । তিনি প্রজাপতির কন্যা, কাঞ্চনবর্ণা ও সূর্যের ভগিনী। তিনি বক্ষদেশ উন্মুক্ত রাখতেন। ব্রহ্মার ন্যায় প্রজাপতিও ছিলেন একজন কামুক দেবতা । কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়নিসংহিতা (৪।১।২২) অনুযায়ী প্রজাপতি নিজ কন্যা ঊষাতে উপগত হয়েছিলেন । ঊষা মৃগীরূপ ধারণ করেছিল । প্রজাপতিও মৃগরূপ ধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গম করেছিল । পিতা প্রজাপতি চন্দ্রের সঙ্গে ঊষার বিবাহ দেবেন ঠিক করেছিলেন । কিন্তু তার বিবাহের খবর পেয়ে অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র ও আশ্বিনীদ্বয় সকলেই তার পাণিপ্রার্থী হয়ে হাজির হন । প্রজাপতি তখন ঘোষণা করেন যে, তাদের মধ্যে অনন্ত আকাশ পথ অনুধাবনে যিনি সমর্থ হবেন, তারই হাতে তিনি ঊষাকে সমর্পণ করবেন। একথা শুনে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য আজীবন এই অনুধাবনের জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যার্থ হয় । একমাত্র অশ্বিনীদ্বয়ই সমর্থ হন । কিন্তু এরা সূর্যের অনুচর বলে, সূর্যের প্রীতিকামনায় ঊষাকে প্রতিগ্রহ করেন না । তার ফলে সূর্যই ঊষাকে বরণ করে নেন।

।। দুই ।।

অপর এক কাহিনী হচ্ছে। যম-যমীর কাহিনী। ঋগ্বেদ অনুযায়ী তারা বিবস্বান ও সরন্যুর সন্তান ও যমজ ভ্রাতা ও ভগিনী । যমী যমের সঙ্গে সঙ্গম আকাঙ্খা করেন, কিন্তু যম তা প্রত্যাখ্যান করেন । ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম সুক্তে এ কাহিনীটা আছে । সেখানে যমী যমকে বলছে —'বিস্তীর্ণ সমূদ্রমধ্যবর্তী এ দ্বীপে এসে এ নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিনী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর । বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দরনপ্তা (নাতি) জন্মিবে।' যম তার উত্তরে বলছে–'তোমার গর্ভসহচর তোমার সাথে এ প্রকার সম্পর্ক কামনা করে না। যেহেতু তুমি সহোদর ভগিনী, তুমি অগম্যা ।' যমী তার উত্তরে বলছে—'যদিচ কেবল মানুষের পক্ষে এ প্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ, তথাপি দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করে থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হচ্ছে, তুমিও তদ্রুপ ইচ্ছা কর । তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও, এস একস্থানে উভয়ে শয়ন করি । পত্নী যেমন পতির নিকট তদ্রুপ আমি তোমার নিকট নিজ দেহ সমর্পণ করে দিই।' যমের উক্তি – 'তোমার ভ্রাতার এরূপ অভিলাষ নেই ।' উত্তরে যমী বলছে– 'তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ দেখছি।' (ঋগ্বেদ ১০।১০।৭-১৪)

।।তিন ।।

ইন্দ্র দেবলোকের রাজা । ইন্দ্র ইন্দ্রিয়াদোষে দুষ্ট । রামায়ণ অনুযায়ী ইন্দ্র গৌতম ঋষির স্ত্রী অহল্যার সতীত্ব নাশ করেছিলেন । অহল্যা ছিলেন ব্রহ্মার মানসী কন্যা ও শতানন্দের জননী । অহল্যার সৌন্দর্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র 'হল' বা বিরূপতা ছিল না । সেজন্যই ব্রহ্মা

তার নাম দিয়েছিলেন অহল্যা । তিনি বহুদিন অহল্যাকে সংযমচিত্ত গৌতম ঋষির কাছে রেখেছিলেন । গৌতম যখন তাকে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় ব্রহ্মার কাছে ফিরিয়ে দেন তখন ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে গৌতমের সঙ্গে অহল্যার বিবাহ দেন । এতে ইন্দ্র ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন, কেননা ইন্দ্র ভেবেছিলেন, এই অপূর্ব সুন্দরী নারী তারই প্রাপ্য। একদিন গৌতম স্নান করবার জন্য আশ্রমের বাহিরে গেলে ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধরে অহল্যার কাছে আসেন ও তার সঙ্গম প্রার্থনা করেন । অহল্যা ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও সেই সময় কামার্তা ছিলেন বলে দুর্মতি বশত তাঁর সঙ্গে সঙ্গমে রত হয়। ইতিমধ্যে গৌতম এসে উপস্থিত হন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন যে ইন্দ্র নপুংসক হবেন । সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের অণ্ড খসে পড়ে । কিন্তু ইন্দ্র দেবতাদের কাছে নিজের দুর্দশার কথা বললে, দেবতারা মেষাণ্ড উৎপাটিত করে ইন্দ্রের দেহে সংযুক্ত করেন। (ইন্দ্রের এই দুর্গতির কারণ সম্পর্কে আগের অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ইন্দ্র একবার বৃষণশ্চ রাজার কন্যা মেনা অভিমুখী হয়েছিলেন । পরে মেনাকে প্রাপ্তযৌবন দেখে ইন্দ্র স্বয়ং তার সাথে সহবাস অভিলাষ করেছিলেন । (ঋগ্বেদ ১।৫২।১৩ সম্বন্ধে সায়ণ ভাষ্য দেখুন) ।

।। চার ।।

বৈদিকযুগে ইন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠ দেবতা, পৌরাণিক যুগে বিষ্ণু তেমনই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। বিষ্ণুও ব্যভিচার দোষ থেকে মুক্ত নন। বিষ্ণুর ব্যভিচার সম্বন্ধে দু'টা কাহিনী বিবৃত

আছে। একটা হচ্ছে জলন্ধরের স্ত্রী বৃন্দা সম্বন্ধে আর একটা শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসী সম্বন্ধে। প্রথমেই বলছি তুলসীর কথা । তুলসী রাধিকার সহচরী। একদিন গোলোকে কৃষ্ণের সঙ্গে তাকে ক্রীড়ারত দেখে, রাধিকা তুলসীকে অভিশাপ দেন যে সে মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করবে । কিন্তু কৃষ্ণ তুলসীকে সান্তনা দিয়ে বলেন, তুমি দুঃখিত হয়ে না, কেননা তপস্যা দ্বারা তুমি আমার এক অংশ পাবে। তুলসী ধর্মধ্বজ রাজার স্ত্রী মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মার তপস্যায় রত হন । ব্রহ্মা তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে, তাকে বর চাইতে বলেন । তুলসী বলে, তিনি নারায়ণকে স্বামীরূপে পেতে চান । ব্রহ্মা বলেন, কৃষ্ণের অঙ্গসম্ভুত সুদাম দানবগৃহে শঙ্খচূড় নামে জন্মগ্রহণ করেছে। তুমি তার স্ত্রী হবে, এবং পরে নারায়ণের পাশে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করবে। তোমাকে না হলে নারায়ণের পূজাই হবে না। যথা সময় শঙ্খচূড়ের সঙ্গে তুলসীর বিবাহ হয়। শঙ্খচূড়ের বর ছিল যে তার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট না হলে, তার মৃত্যু হবে না। শঙ্খচূড়ের অত্যাচার ও উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা ব্রহ্মা ও শিবের সঙ্গে নারায়ণের কাছে যায়। নারায়ণ বলেন, শিব শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলে, তিনি তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করবেন। যুদ্ধের সময় নারায়ণ শঙ্খচূড়ের রূপধারণ করে, তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করে। তখন শিবের হাতে শঙ্খচূড় নিহত হয় । নারায়ণ ছদ্মবেশে তার সতীত্ব নষ্ট করেছে জানতে পেরে, তুলসী নারায়ণকে অভিশাপ দেয়, 'আজ থেকে তুমি পাষাণে পরিণত হও!' সেই থেকে নারায়ণ শিলারূপে অবস্থিত হয়ে সর্বদা তুলসীযুক্ত হয়ে থাকেন । এটা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কাহিনী। পদ্মপুরাণের কাহিনী অনুযায়ী তুলসী জলন্ধর নামে এক অসুরের স্ত্রী বৃন্দা। শিবের সঙ্গে জলন্ধরের যুদ্ধ হয়। বৃন্দা স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য বিষ্ণুপূজায় প্রবৃত্ত হয়। তখন বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে বৃন্দার সামনে এসে উপস্থিত হন । স্বামীকে অক্ষত দেহে

ফিরে আসতে দেখে, বৃন্দা পূজা অসমাপ্ত রেখে উঠে পড়ে । তাতেই জলন্ধরের মৃত্যু হয়। বৃন্দা বিষ্ণুকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে, বিষ্ণু ভীত হয়ে বৃন্দাকে বলে, তুমি সহমৃতা হও, তোমার ভস্ম থেকে (অন্য মতে কেশ থেকে) তুলসী বৃক্ষ উৎপন্ন হবে, এবং তুমি লক্ষ্মীর ন্যায় আমার প্রিয় হবে । তোমা ব্যতীত নারায়ণের পূজা হবে না।

দেবলোকের খুব চাঞ্চল্যকর ব্যভিচার হচ্ছে দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারার সঙ্গে চন্দ্রের ব্যভিচার । তারার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে চন্দ্র একবার তারাকে হরণ করে। এই ঘটনায় বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হয়ে চন্দ্রকে শাস্তি দেবার জন্য দেবতাদের সাহায্য প্রার্থনা করে । তারাকে ফেরত দেবার জন্য দেবতা ও ঋষিগণ চন্দ্রকে অনুরোধ করে । চন্দ্র তারাকে ফেরত দিতে অরাজী হয়, এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের সাহায্য প্রার্থনা করে। রুদ্রদেব বৃহস্পতির পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন । দেবাসুরের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধের আশঙ্কায় ব্রহ্মা মধ্যস্থ হয়ে বিবাদ মিটিয়ে দেন। চন্দ্র তারাকে বৃহস্পতির হাতে প্রত্যপণ করে। কিন্তু তারা ইতিমধ্যে চন্দ্র কর্তৃক অন্তসত্বা হওয়ায়, বৃহস্পতি তাকে গর্ভত্যাগ করে তার কাছে আসতে বলে । তারা গর্ভত্যাগ করার পর এক পুত্রের জন্ম হয় । এর নাম দস্যু সুন্তম্ । ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞাসা করেন এই পুত্র চন্দ্রের ঔরসজাত কিনা ? তারা ইতিবাচক উত্তর দিলে চন্দ্র সেই পুত্রকে গ্রহণ করে, ও তার নাম রাখে বুধ ।

আর্যদেবতামণ্ডলীর দেবতাগণের ব্যভিচারের আরও দৃষ্টান্ত আছে। এখানে আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি । বরুণ ঋগ্বেদের একজন প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদের ঋষিরা আকাশকে সমুদ্রের সঙ্গে কল্পনা করে আকাশের দেবতা বরুণকে জলময় মনে করতেন !

মহাভারতে আছে যে বরুণ চন্দ্রের কন্যা উতথ্যের স্ত্রী ভদ্রার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করে নিয়ে যায়। অনেক পীড়াপীড়ি সত্বেও বরুণ যখন ভদ্রাকে ফিরিয়ে দিল না, উতথ্য তখন সমস্ত জলরাশি পান করতে উদ্যত হলেন । তখন বরুণ ভয় পেয়ে ভদ্রাকে ফিরিয়ে দিল ।

আমরা আবার পড়ি একবার অশ্বিনীকুমারদ্বয় শর্যাতি রাজার মেয়ে যৌবনদীপ্ত সুকন্যাকে স্নানের পর নগ্নাবস্থায় দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ স্বামী চ্যবনকে ত্যাগ করে তাদের গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ করেছিল। আর্যদেবতামণ্ডলীর যৌন-জীবনে পরস্ত্রীকে এভাবে ফুসলে নিয়ে যাওয়া-আদর্শ নীতির পরিচায়ক নয়।

আবার রামায়ণের আদিকাণ্ডে আমরা পড়ি যে একবার পবনদেব রাজর্ষি কুশনাভের একশত পরম রূপবতী কন্যাদের ধর্ষণ করতে অভিলাষ করেছিলেন । মেয়েগুলি অস্বীকৃত হলে, পবনদেব তাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে, তাদের শরীর ভগ্ন করে দেন | পবনদেব কেশরীরাজ অঞ্জনার গর্ভে হনুমানকে উৎপাদন করেছিলেন ।

দেবতারা অনেক সময় অস্বাভাবিক মৈথুনেও রত হতেন । সংজ্ঞা বিশ্বকর্মার কন্যা ও সূর্যের স্ত্রী । সংজ্ঞা সূর্যের অসহ্য তেজ সহ্য করতে না পেরে, নিজের অনুরূপ ছায়া নামে এক নারীকে সূর্যের কাছে রেখে, উত্তরকুরুবর্ষে ঘোটকীর রূপ ধরে বিচরণ করতে থাকে। পরে সূর্য যখন এটা জানতে পারে, তখন তিনি বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে নিজের তেজ কর্তন করে অশ্বরূপ ধারণ করে ঘোটকীরূপিনী সংজ্ঞার কাছে এসে তার সঙ্গে

সঙ্গমে রত হয় । এই মিলনের ফলে প্রথমে যুগলদেবতা অশ্বিনীকুমার ও পরে রেবন্তের জন্ম হয় । এরপর সূর্য নিজের তেজ কর্তন করায় সংজ্ঞা নিজের রূপ ধারণ করে স্বামীগৃহে ফিরে আসে।

প্রজাপতির কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রজাপতির কন্যা ঊষা যখন মৃগীরূপ ধারণ করেছিল, প্রজাপতি তখন মৃগরূপ ধারণ করে কন্যায় উপগত হয়েছিলেন । শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে এই অপকর্মের জন্য রুদ্র প্রজাপতিকে এক তীক্ষ বানদ্বারা আঘাত করেছিলেন । কিন্তু ঋগ্বেদ (১০।৬১।৫-৭) অনুযায়ী রুদ্র নিজেও এই অপকর্ম করেছিলেন ।

।। পাঁচ ।।

দেবলোকে যে মাত্র পুরুষরাই ব্যভিচার করত, তা নয়। দেবালোকের মেয়েরাও ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত। আগেই বলেছি যে দক্ষকন্যা স্বাহা অগ্নিকে কামনা করতেন । সপ্তর্ষিদের যজ্ঞে অগ্নি (এ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে অগ্নিও একজন কামুক দেবতা) যখন সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দেখে কামার্ত হয়ে ওঠে স্বাহা তখন এক এক ঋষিপত্নীর রূপ ধরে ছয়বার অগ্নির সঙ্গে সঙ্গম করে । ছয়বারই অগ্নির বীর্য কাঞ্চনকুম্ভে নিক্ষিপ্ত হয় । এই ঘটনার পর সপ্তর্ষিরা তাদের স্ত্রীদের সন্দেহ করে পরিত্যাগ করে । সপ্তর্ষিদের অন্যতম বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর তপোপ্রভাবে স্বাহা আর তার রূপ ধারণ করতে পারেনি। বিশ্বামিত্র প্রকৃত ব্যাপার জানতেন বলে তিনি ঋষি-স্ত্রীদের নির্দোষী বলেন । কিন্তু ঋষিরা

তা বিশ্বাস করে না। পরে স্বাহা অগ্নির স্ত্রী হন। কিন্তু স্বর্গে গিয়েও স্বাহার স্বভাব পরিবর্তিত হয় না । তিনি নিজ স্বামীকে ছেড়ে, কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাবার জন্য তপস্যা করতে থাকেন । বিষ্ণুর বরে দ্বাপরে স্বাহা নগ্নজিৎ রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পায় ।

।। ছয় ।।

আবার ইন্দ্রের কথাতেই ফিরে আসছি। একবার দেবতা ও মহর্ষিরা ইন্দ্রকে স্বর্গ থেকে বিতারিত করেছিল । তাঁরা নহুষকে ইন্দ্রের আসনে বসান । কিন্তু আসনের দোষ যাবে কোথায় ? কিছুকাল পরে নহুষ ইন্দ্রের স্ত্রী শচীকে হস্তগত করবার চেষ্টা করে । শচী বিপদাপন্ন হয়ে নিজেকে নহুষের কামলালসা থেকে রক্ষা করবার জন্য বৃহস্পতির পরামর্শে শচী নহুষকে বলে যে নহুষ যদি সপ্তর্ষি-বাহিত যানে তার কাছে আসে, তা হলে সে নহুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। নহুষ সপ্তর্ষি বাহিত শিবিকায় যাবার সময় অগস্ত্যের মাথায় পা দিয়ে ফেলেন। এর ফলে, অগস্ত্যের শাপে নহুষ অজগর সর্পরূপে বিশাখাযুপ বনে পতিত হন । এভাবে শচীর সতীত্ব রক্ষা পায় ।

।। সাত ।।

সমুদ্রমন্থনের পর দেবাসুরে যখন আবার যুদ্ধ হয়, বিপ্রচিত্তী তখন অসুরগণের, সেনাপতি ছিলেন । বিপ্রচিত্তী কশ্যপের স্ত্রী দনুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি নিজের বৈমাত্রেয় ভগিনী সিংহিকাকে বিয়ে করেছিলেন ।

দেবদেবীর অজাচার

আগের অধ্যায়ে আমরা দেবালোকের অজাচার ও ব্যভিচার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি । দেবতাদের বিশেষ যৌনাচারকে আমরা অজাচার ও ব্যভিচার বলে বর্ণনা করেছি। এই কারণে যে, যে সমাজের প্রতিরূপে দেবীসমাজ কল্পিত হয়েছিল, সে সমাজে আজ এরূপ আচরণ অজাচার ও ব্যভিচার বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদগণ বলেন যে এসব মানুষের মনগড়া। এ সম্বন্ধে Havelock Ellis তাঁর Psychology of Sex বইয়ে বলেছেন–"Freud holds that there is from infancy a strong natural instinct to incest; Mallinowski does not accept the aversion to incest as natural but as introduced by culture, a complex scheme of cultural reactions'. . . . . . .There is a sexual attraction towards persons with whom there is close contact, such persons being often relations, and the attraction being therefore termed incestuous." Vestermarck তাঁর History of Human Marriage বইয়ের প্রথম সংস্করণে অজাচারকে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বলতে চান নি, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে অজাচার মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি বলে মত প্রকাশ করেন । এ সম্পর্কে Crawley, Heape প্রভৃতি মনীষীগণও ওই মত পোষণ করেছেন । সামাজিক রীতিনীতির প্রতিক্রিয়াতেই মানুষের মনে অজাচার সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠেছে বলেই এ সম্বন্ধে এক সমাজের রীতিনীতি অপর সমাজের কাছে সম্পূর্ণ দুষ্ট । বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেই একজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ

উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার বলেছিলেন যে লোকাচারই স্থির করে দেয় কোনটা দুষ্ট, আর কোনটা দুষ্ট নয় ! আমার নানা লেখার মধ্যে আমি বার বার একথা বলেছি যে আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে সামাজিক স্বীকৃতিই হচ্ছে আসল জিনিষ । এক সমাজ যেটা অনুমোদন করবে, আর এক সমাজ সেটা অনুমোদন না-ও করতে পারে । আবার যে কোন সমাজে এককালে যে আচরণ স্বীকৃত হত, পরবর্তীকালে সেই সমাজ কর্তৃকই সেটা স্বীকৃত না-ও হতে পারে । আমাদের বাঙালী সমাজেই এ-রকম ঘটনা বার বার ঘটেছে । **১৯১৮** খ্রীষ্টাব্দে “ম্যান ইন ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায় আমি দেখিয়েছিলাম যে এক সময় বাঙালী সমাজে শালীবরণ ও দেবরবরণ এই দুই প্রথাই প্রচলিত ছিল । বর্তমানকালে কন্যার বিবাহের সময় অনুসৃত জামাইবরণ প্রথা শালীবরণ প্রথার অন্তিম নিদর্শন ।

।। দুই ।।

এবার শুনে চমকে উঠবেন না যে সহোদরাকে বিবাহ করা যদিও আজকের হিন্দুর কাছে অজাচার বলে গণ্য হয় তা হলেও এরূপ বিবাহ এক সময়ে ভারতীয় সমাজে স্বীকৃত হত। বাঙালী সমাজেও হত । এর প্রমাণ আমরা পাই সিংহল দেশের ‘দীপবংশ’ ও ‘মহাবংশ’ নামে দুই প্রাচীন গ্রন্থ থেকে । সেখানে বিবৃত হয়েছে যে গৌতম বুদ্ধের অবিভাবের পূর্বে বঙ্গদেশের বঙ্গনগরে এক রাজা ছিলেন। তিনি কলিঙ্গদেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তঁদের এক অতি সুন্দরী কন্যা হয় ; কিন্তু সে অত্যন্ত দুষ্টা ছিল । সে একবার পালিয়ে গিয়ে মগধ-যাত্রী এক বণিকের দলে ঢুকে যায়। তারা যখন বাঙলার সীমানায় উপস্থিত হয়, তখন এক সিংহ তাদের আক্রমণ করে। বণিকেরা

ভয়ে পালিয়ে যায় । কিন্তু রাজকন্যা সিংহকে তুষ্ট করে তাকে বিবাহ করে । মনে হয় এখানে আক্ষরিক অর্থে 'সিংহ' না ধরে, সিংভূম জেলার 'সিংহ' উপাধিধারী কোন উপজাতীয়কে ধরে নিলে, এর অর্থ খুব সরল হয়ে যাবে। ওই সিংহের ঔরসে মেয়েটির গর্ভে সিংহবাহু নামে এক পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে। সিংহবাহু বড় হয়ে সিংহকে হত্যা করে ও নিজ ভগ্নীকে বিবাহ করে । পরে রাঢ়দেশে সে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে । সহোদরার গর্ভে ও তার ঔরসে সিংহবাহুর অনেকগুলি পুত্র সন্তান হয়। প্রথম দুটির নাম বিজয় ও সুমিত্র । বিজয় অত্যন্ত দুর্বিনীত ও অত্যাচারী ছিল । তার দুর্ব্যবহারে রাজ্যবাসীগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে । বাধ্য হয়ে রাজা সাতশত অনুচরের সঙ্গে বিজয়কে এক নৌকা বরে সমুদ্রে পাঠিয়ে দেন । বিজয় নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপে এসে, কুবেনী নামে এক যক্ষিণীকে বিবাহ করে ও সিংহল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে । বিজয় যেদিন লঙ্কাদ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছিল, সেদিনই কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন । এই কাহিনী থেকে দুটি তথ্য প্রকাশ পায়। প্রথম, বিজয়ের সময়কাল ভগবান বুদ্ধের সমকালীন ও দ্বিতীয় বিজয়ের পিতা সিংহবাহু নিজ সহোদরাকে বিবাহ করেছিলেন ।

।। তিন ।।

নিজ সহোদরা বা সমগোত্রীয়াকে বিবাহ করা প্রাচীনকালে প্রাচ্য ভারতে প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থ সমূহে আমরা এর ভুরিভুরি প্রমাণ পাই । বৌদ্ধ সাহিত্যের এক জায়গায় আমরা পড়ি যে, রাজা ওক্ককের (ইক্ষাকুর) প্রধানা মহিষীর গর্ভে পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। ওই প্রধান মহিষীর মৃত্যুর পর রাজা এক যুবতীকে বিবাহ

করেন । এই রাণীর যখন এক পুত্র হয়, তখন তিনি রাজাকে বলেন যে তাঁর ছেলেকেই রাজা করতে হবে । রাজা তার প্রথম মহিষীর পাঁচ পুত্র ও চার মেয়েকে হিমালয়ের পাদদেশে নির্বাসিত করেন। সেখানে কপিলমুনির সঙ্গে তাদের দেখা হয়। কপিলমুনি তাদের সেখানে একটি নগর স্থাপন করে বসবাস করতে বলেন । এই নগরের নামই কপিলাবস্তু হয় । ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অকৃতদার রইলেন। আর বাকী চার ভাই চার বোনকে বিবাহ করে । 'মহাবস্তু' নামে বৌদ্ধগ্রন্থে এই কাহিনীটা আছে ।

বৌদ্ধ সাহিত্যের আর এক কাহিনীতে (অশ্বতথ সুত্ত ১।১৬ ; কুনাল জাতিক ৫৩৬) শাক্যরা ছিল পাঁচ বা েন ও চার ভাই। এই কাহিনী অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ ভগিনীকে তারা মাতৃরূপে বরণ করে, আর চার ভাই চার বোনকে বিবাহ করে ।

বৌদ্ধ সাহিত্যের আর এক কাহিনী পড়ুন। বুদ্ধঘোষের 'পরমথজ্যোতিকা,' (ক্ষুদ্দকপথ পৃঃ ১৫৮-৬০) কাহিনী অনুযায়ী বারানসীর রাজার প্রধান মহিষী একখণ্ড মাংসপিণ্ড প্রসব করেন । তিনি ওই মাংসপিণ্ডটিকে একটি পেটিকায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেন । ওটা যখন ভেসে যাচ্ছিল, তখন একজন মুনি ওটাকে তুলে সংরক্ষণ করেন। পরে ওই মাংসপিণ্ড থেকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে উৎপন্ন হয়। তাদের নাম লিচ্ছবী দেওয়া হয় । এদের দুজনের মধ্যে বিবাহ হয়, এবং এরা বৈশালী রাজ্য স্থাপন করে ।

আবার দশরথজাতক অনুযায়ী পূর্বকালে বারানসীর রাজা দশরথের প্রধান মহিষীর গর্ভে তিন সন্তান জন্মায়–রামপণ্ডিত, লক্ষণকুমার ও সীতাদেবী। ওই মহিষীর মৃত্যুর পর

দশরথ অপর একজনকে প্রধান মহিষী করেন । তার গর্ভে ভরত নামে এক সন্তানের জন্ম হয় । দশরথ একবার ভারতের মাকে একটা বর দিয়েছিলেন । সেই বরের জোরে ভরতের মা ভরতকে রাজা করতে হবে বলে দাবী করেন । তখন দশরথ রাম ও লক্ষণকে দুরান্তরে গিয়ে থাকতে বলেন, এবং বলেন যে বারো বছর পরে তাঁর মৃত্যু ঘটলে রাম যেন ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করে । রাজার এই কথায় রাম ও লক্ষণ সীতাকে নিয়ে হিমালয় প্রদেশে চলে যান । এর নয় বৎসর পরে দশরথের মৃত্যু ঘটে । তখন ভরত রামকে ফিরিয়ে আনতে যায় । কিন্তু বারো বৎসর পূর্ণ হবার আগে রাম ফিরতে চাইলেন না । বারো বৎসর উত্তীর্ণ হলে, রাম বারানসীতে ফিরে এসে রাজা হন ও সীতাকে বিবাহ করে তাঁর মহিষী করেন ।

সহোদরাকে বিবাহ করার কাহিনীসমূহ যে মাত্র বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে, তা নয়। অন্যান্য সাহিত্যেও আছে। অন্যান্য সাহিত্যে যে সব প্রমাণ আছে, তা থেকে মনে হয় যে প্রাচ্যভারতে সহোদরার অভাবে অন্য বোনকেও বিবাহ করা যেত । অৰ্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত জৈন্য সাহিত্যে এরূপ বিবাহের উল্লেখ আছে যেমন নন্দিতা বিবাহ করেছিল, তার মাতুলকন্যা রেবতীকে ।

আমি আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' গ্রন্থে দেখিয়েছি যে (দশরথজাতকে বিবৃত) মাত্র রামই নিজ ভগিনীকে বিবাহ করেন নি, রামের পিতা দশরথও তাই করেছিলেন । দশরথের সঙ্গে কৌশল্যার বিবাহই তার দৃষ্টান্ত । দশরথ কৌশল বংশের নৃপতি ছিলেন । কৌশল্যাও যে সেই বংশেরই মেয়ে ছিলেন, তা তার নাম থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে । (

তুলনা করুন গান্ধারী, মাদ্রী, কৈকেয়ী, বৈদেহী, কুন্তী, দ্রৌপদী ইত্যাদি) । সুতরাং নিজ বংশেই যে রাজা দশরথ বিবাহ করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । আজকালিকার দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ, অজাচার বলে গণ্য হবে । কিন্তু উত্তর ভারতের পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ যে এক সময় প্রচলিত প্রথা ছিল এবং তার সামাজিক স্বীকৃতিও ছিল, তা উপরের কাহিনীসমূহ থেকে প্রকাশ পায় ।

।। চার ।।

এইবার প্রাচীন কাল ছেড়ে দিয়ে, বর্তমান কালে আসুন । বর্তমানে উত্তর ভারতের বিবাহ গোত্র-প্রবর ও সপিণ্ড বিধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত । তার মানে বিবাহে নিজ গোত্র-প্রবর ও সপিণ্ড পরিহার্য । কিন্তু এর শিথিলতা আমরা দক্ষিণ ভারতে লক্ষ্য করি । সেখানে মামা-ভগ্নীর মধ্যে বা মামাতো বোন কিংবা পিসতুতো বোনের সঙ্গে বিবাহই বাঞ্ছনীয় বিবাহ । তবে যেখানে মামা-ভাগ্নীর মধ্যে বিবাহ (যেমন তামিলনাড়ুতে) প্রচলিত আছে, সেখানে এরূপ বিবাহ সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিধি নিষেধ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে বিবাহ মাত্র বড় বোনের মেয়ের সঙ্গেই হয় । ছোট বোনের মেয়ের সঙ্গে হয় না । মারাঠা দেশে এরূপ বিবাহ মাত্র পিতৃকেন্দ্রিক জাতিসমূহের মধ্যেই দেখা যায়। মাতৃকেন্দ্রিক জাতিসমূহের মধ্যে এটা নিষিদ্ধ। সে যাই হোক, উত্তর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীতে এটা অজাচার, কেননা মাতুল পিতারই সমপর্যায়ের লোক ।

ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ মাত্র পিসতুতো বোন ও মামাতো বোনের সঙ্গেই হয় । তার মানে এক ক্ষেত্রে বিবাহ হয় মামাতো ভায়ের সঙ্গে, আর অপর ক্ষেত্রে বিবাহ হয় মামাতো বোনের সঙ্গে । মাসতুতো বোনের সঙ্গে বিবাহ যদিও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ, তথাপি এর প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় অন্ধ্রপ্রদেশের কোমতি ও কুরুর জাতিদ্বয়ের মধ্যে । তার মানে এদের সমাজে মাসতুতো বোনকেও বিবাহ করা যায়। কর্ণাটকের কোন কোন জাতির মধ্যে এর প্রচলন আছে ; তবে কর্ণাটক দেশে দশস্থ ব্রাহ্মণরা ভাগ্নী ও মামাতো বোনকেই বিবাহ করে ।

যদিও উত্তর ভারতে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ সাধারণভাবে প্রচলিত নেই, তথাপি অনুমান করা যেতে পারে যে, এক সময় এর ব্যাপকতা ছিল । আমরা আগেই বলেছি যে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এর বহু উল্লেখ আছে। বর্তমানে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, কাথিয়াবাড়, মহারাষ্ট্র ও ওড়িষার কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। রাজপুতদের মধ্যে মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহ বাধ্যতামূলক না হলেও, এরূপ বিবাহ প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। রাজস্থান, কাথিয়াবাড়, ও গুজরাটের রাজন্যবর্গের মধ্যে এরূপ বিবাহের অনেক নিদর্শন আছে । যোধপুরের রাজপরিবারে পিসতুতো বোনের সঙ্গে বিবাহের দৃষ্টান্ত আছে, মামাতো বোনের সঙ্গে নেই । তার মানে, মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহ এক্ষেত্রে অনুমোদিত নয়। কিন্তু কাথি, আহির ও গাধব চারণদের মধ্যে মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহের কোন বাধা নেই । মহারাষ্ট্রের কুন্নবীদের মধ্যে কোন কোন শাখা ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ অনুমোদন করে, কিন্তু অপর কতিপয় শাখা তা করে না । মধ্য মহারাষ্ট্রের মারাঠাদের মধ্যে কোন

কোন সম্প্রদায়ের লোক মাত্র মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহ অনুমোদন করে, কিন্তু ওর দক্ষিণে অবস্থিত লোকেরা মামাতো ও পিসতুতো উভয়শ্রেণীর বোনের সঙ্গেই বিবাহ মঞ্জুর করে । প্রাচীন কালেও যে এর প্রচলন ছিল তার প্রমাণ রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদ্যুম্ন তার মাতুলকন্যা কুকুন্দমতীকে বিবাহ করেছিল।

।। পাঁচ ।।

আদিবাসী সমাজেও অনেক রকম বিবাহ প্রথা আছে, যা হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে অজাচার বলে গণ্য হবে। দুটি বিশেষ ধরনের বিবাহ প্রথা উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে। আসামের গারো জাতির লোকেরা বিধবা শ্বাশুড়ীকে বিবাহ করে, আর লাখের, বাগনী ও ডাফল জাতির লোকেরা বিধবা বিমাতাকে বিবাহ করে । শ্বাশুড়ীকে কিংবা বিমাতাকে বিবাহ করা এদের কাছে অজাচার নয়। আগেই বলেছি যে সমাজই বিধান দেয়, কোনটা অজাচার, আর কোনটা অজাচার নয় । গারোদের কথাই ধরা যাক । গারোরা যখন শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করে, তখন সেটা অজাচার নয় । কিন্তু গারোদের উপশাখা সাঙমারা যদি কোন সাঙমা উপশাখার মেয়েকে বিয়ে করে, তাহলে সেটা অজাচার । তখন তাকে মাডোঙ বলা হয় । 'মাডোঙ' মানে 'যে লোক নিজের মাকে বিয়ে করে ।' তবে শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করা, মাত্র গারো সমাজেই প্রচলিত প্রথা নয় । অন্যত্রও এর প্রচলন আছে। মধ্য ব্রেজিলের টুপি-কোওয়াহিব জাতির লোকেরা একসঙ্গেই শ্বাশুড়ী ও তার মেয়েকে বিয়ে করে ।

আমরা আগেই বলেছি যে লাখের, বাগনী ও ডাফলাজাতির লোকেরা বিমাতাকে বিয়ে করে । এরূপ বিবাহের জন্য বাগনীজাতির বৃদ্ধ পিতারা যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তখন বিশেষভাবে অধিক যুবতী মেয়েদের নির্বাচন করে বিবাহ করে, যাতে তার মৃত্যুর পর তার পুত্র যুবতী বিমাতাকেই স্ত্রীরূপে লাভ করতে পারে ।

মা-মাসীকে বিয়ে করাটা যে একেবারে অজাচার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । অথচ, এর বিপরীত প্রথাটা তো দক্ষিণ ভারতের কিছু সমাজেই প্রচলিত আছে। মাতুলের কাছে ভাগ্নী তো কন্যাসম, এবং ভাগ্নীর কাছে মাতুল তো পিতাসম অথচ মামা-ভাগ্নীর মধ্যে বিবাহটািই হচ্ছে সেখানে বাঞ্ছনীয় বিবাহ। তবে একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন । গারোদের মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর পুত্র যাতে যুবতী বিমাতাকে স্ত্রীরূপে পায়, তার জন্য গারো পিতার কমবয়সী মেয়েদেরই দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সমাজে যেখানে বাঞ্ছনীয় বিবাহ প্রচলিত আছে, সেখানে অনেক সময়ই দেখা যায় যে বাঞ্ছনীয় কন্যা বরের মাতার বয়সী । সেজন্য এরূপ বিবাহে বর ও কনের বয়সের মধ্যে যত বছরের তফাৎ, বিবাহের সময় কনেকে ততগুলো নারিকেল কোমরে বেঁধে নিয়ে বিবাহ করতে হয় ।

।। ছয় ।।

পিতা-পুত্রীর বা মাতা-পুত্রের মধ্যে যৌনমিলনের কথা দেশবিদেশের পুরাণেও বিবৃত আছে। আমাদের পুরাণ অনুযায়ী ব্রহ্মা নিজ কন্যা শতরূপাকেই বিবাহ করেছিলেন ।

এদের সঙ্গমের ফলে মনুর জন্ম হয়। মনু থেকে পৃথিবীতে মানবজাতির সৃষ্টি হয় । সুতরাং মানুষের রক্তের মধ্যেই অজাচারের বীজ গোড়া থেকে আছে ।

মাতা-পুত্রের মধ্যে যৌনমিলনের ক্লাসিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গ্রীক পুরাণে-জোকাস্টা ও ইডিপাসের কাহিনীতে । এই কাহিনী অনুযায়ী থিবসের রাজা ইডিপাস। তাঁর নিজ গর্ভধারিনী মাতাকেই বিবাহ করেছিল, এদের দুজনের মধ্যে সঙ্গমের ফলে দুই পুত্র পলিওনিসেন ও ইটিওক্লিস ও তুই কন্যা অ্যানটিগনি ও ইসমিন জন্মগ্রহণ করে ।

এরূপ সঙ্গম যে দেবসমাজে অনিন্দনীয় ছিল, তা অর্জুনের প্রতি উর্বশীর উক্তি থেকে প্রকাশ পায় ।

।। সাত ।।

উপরি-উক্ত কাহিনীসমূহ থেকে বোঝা যায় যে মনুষ্যসমাজে অজাচারের অন্ত নেই। এবার আমি অজাচারের একটা সংজ্ঞা দিতে চাই। পাত্র-পাত্রী এই উভয়ের মধ্যে যেখানে রক্তের সম্পর্ক আছে, সেখানে যদি যৌনমিলন ঘটে, তাহলে সেটাই অজাচার । কিন্তু যেখানে রক্তের সম্পর্ক আছে, সেখানে গোপন যৌনমিলন তো আখচারই ঘটে ।

এক কথায়, যেখানে রক্তের সম্পর্ক আছে, সেখানে ওটা অজাচার । আর যেখানে রক্তের সম্পর্ক নেই, সেখানে ওটা ব্যভিচার । কিন্তু এরূপ সম্পর্ক যদি সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়,

তাহলে এটা অজাচার নয়। উত্তর ভারতে হিন্দুদের মধ্যে অজাচার পরিহার করবার জন্য যে সকল সামাজিক বিধি নিষেধ আছে, সেগুলো হচ্ছে- গোত্রভেদ, প্রবরভেদ ও সপিণ্ডবিধান। শেষোক্ত বিধান অনুযায়ী পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে চার পুরুষ পরিহার করতে হয়। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও গোত্র-প্রবর বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু সপিণ্ডবিধান যথেষ্ট শিথিল । এ রকম শিথিলতা আমরা আদিবাসী সমাজেও লক্ষ্য করি । যেমন গারোদের মধ্যে আমরা দেখেছি যে বিমাতাকে বিয়ে করা অজাচার নয়, কিন্তু নিজ গভর্ধারিণী মাতা বা একই উপশাখার মধ্যে অন্য মেয়েকে বিয়ে করা অজাচার। অজাচার সম্বন্ধে এসব বিচিত্র রীতি যে মাত্র হিন্দু বা আদিবাসী সমাজেই প্রচলিত, তা নয়। প্রাচীন মিশর ও ইনকা রাজপরিবারসমূহে এর প্রচলন ছিল । পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহেও তাই । ইংলেণ্ডের কথাই ধরুন । ইংলেণ্ডে অজাচার বলে কিছু ছিল না, যতক্ষণ না, তা যাজকীয় আদালতসমূহের দৃষ্টির মধ্যে আসত। কিন্তু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ইনসেষ্ট অ্যাক্ট ১৯০৮' প্রণীত হবার পর থেকে, অপরাধ হিসাবে অজাচার সাধারণ আদালতের বিচারাধীন হয়েছে । ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এই আইন অনুযায়ী যদি কোন পুরুষ তার নাতনী, মেয়ে, বোন বা মায়ের সঙ্গে যৌন সংসর্গ করে, তবে তা অজাচার বলে গণ্য হয় ও তার জন্য তাকে দণ্ড পেতে হয় । যে মেয়ের সঙ্গে সে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছে তার সম্মতি থাকলেও সেটা অজাচার এবং ওই মেয়েকেও অনুরূপ দণ্ড পেতে হয় । এই আইন অনুযায়ী ভাই-বোন বলতে যে নিজের সহোদর-সহোদরাকে বুঝায় তা নয়। যে কোন রকমের ভাই-বোন হলেই, সেটা অজাচার । এই আইন অনুযায়ী পিতার পূর্ববর্তী স্ত্রীর পুত্র ও কন্যা, বা মাতার পূর্ববর্তী স্বামীর পুত্র ও কন্যাও দণ্ডনীয় অজাচারের অন্তভূক্ত ভাই-বোন । এই আইনের দিক থেকে যেটা লক্ষণীয়, তা হচ্ছে এখানে বিবাহের কথা

বলা হয় নি, যৌন সংসর্গের কথাই বলা হয়েছে । এ সম্বন্ধে বিলাতের আইনের মধ্যে এক সূক্ষ্মতা আছে । যেমন শ্যালিকাকে বিবাহ করা যায়, কিন্তু শ্যালিকার সঙ্গে 'যৌন সংসর্গ' স্থাপন করা অজাচার। স্যার জেমস ফ্রেজারের আমল থেকে আজ পর্যন্ত নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদগণ 'অজাচার' সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণার নানা কারণ নির্দেশ করেছেন । কিন্তু আজ পর্যন্ত এর কোন সর্ববাদী-সম্মত মতবাদ উদ্ভূত হয় নি। মোট কথা, সমাজ যেটাকে অজাচার মনে করে, সেটাই অজাচার, আর যেটাকে অজাচার বলে গণ্য করে না, সেটা অজাচার নয় ।

।। আট ।।

অজাচারেরই সহাোদর ভাই হচ্ছে ব্যভিচার । তবে ব্যভিচারের অর্থ অজাচারের চেয়ে অনেক ব্যাপক। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে সমাজের বিধান-বহির্ভুত যৌন-সংসর্গ ঘটলেই সেটাকে অজাচার বলা হয়। এরূপ আত্মীয়ের মধ্যে যৌন মিলন স্থাপনের পক্ষে সমাজের যদি কোন বিধান না থাকে, তা হলে সেটা ব্যভিচারও বটে। নিজ স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অপরের সঙ্গে যৌন সংসর্গ ঘটলেই সাধারণত তাকে ব্যভিচার বলা হয়। সে পুরুষ বা নারী নিজ ঘনিষ্ঠ, আত্মীয়ও হতে পারে, বা অপর কেউও হতে পারে। তবে অপর পুরুষের সঙ্গে যৌন-সংসর্গ সমাজ অনেক সময় ব্যভিচার বলে গণ্য করে না । যেমন প্রাচীন কালের নিয়োগ প্রথা, অতিথি সৎকারের জন্য স্ত্রীকে সমর্পণ করা, ধমীয় সংস্কার ও ধর্মীয় লাম্পট্য, বা বর্তমানকালে ওড়িষ্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে যৌন-সংসর্গের জন্য গ্রহণ করা ।

নিয়োগ প্রথা সুবিদিত। তবে নিয়োগ প্রথা সম্বন্ধে এখানে দুএকটা কথা বলা প্রয়োজন । নিয়োগ প্রথায় যে যৌন অধিকার থাকত তা সাধারণ রমণের অধিকার নয় । মাত্র সন্তান উৎপাদনের অধিকার । সন্তান উৎপন্ন হবার পর এ অধিকার আর থাকত না | শাস্ত্র অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা বা কোন নিকট আত্মীয়, বিশেষ করে সপিণ্ড বা সগোত্রকেই এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হত। নিয়োগ প্রথা অনুযায়ী মাত্র এক বা দুটি সন্তান উৎপন্ন করা হোত, তার অধিক নয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সন্তান প্রজননের সময় উভয়ে নিজ নিজ চিত্তবৃত্তিকে এমনভাবে উন্নীত করবে যে পরস্পর পরস্পরকে শ্বশুর ও পুত্রবধু বিবেচনা করবে। (উপমাটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়) । সমাজের দৃষ্টিতে কোনটা অজাচার, আর কোনটা অজাচার নয়। সে সম্পর্কে এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে এই উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র কোন আত্মীয়কেই আহবান করা যেত, অপরকে নয়। স্মৃতিযুগের শেষের দিকে কিন্তু নিয়োগ প্রথা পরিত্যক্ত হয়েছিল। বৃহস্পতি বলেছেন কলিযুগে ‘নিয়োগ’ প্রথা যুক্তিযুক্ত নয়। মনু যদিও তার ধর্মশাস্ত্রের এক অংশে এর অনুমোদন করেছেন, অপর অংশে তিনি এই প্রথাকে সম্পূর্ণভাবে গর্হিত ঘোষণা করেছেন ।

।। নয় ।।

পরবর্তীকালের সমাজে পতিব্রতা স্ত্রীর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, সে সংজ্ঞা অনুযায়ী আগেকার যুগের সমাজের যৌনপ্রথাগুলি যে অজাচার বা ব্যভিচার ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রাচীনকালের সমাজে এগুলি অজাচার বা ব্যভিচার বলে গণ্য হত না

। সেজন্যই অতিথির সঙ্গে সঙ্গমে রত হওয়া, সে যুগে ব্যভিচার বলে গণ্য হত না। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বর্ণিত সুদর্শন ও ওঘাবতী কাহিনী এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে। এই কাহিনী অনুযায়ী সুদর্শন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম পালন করেই মৃত্যুকে জয় করবেন। সংকল্প করেছিলেন । স্ত্রী ওঘাবতীকে অতিথি সৎকার কাজে নিয়োজিত করে তিনি তাকে আদেশ দেন যে প্রয়োজন হলে ওঘাবতী যেন নির্বিচারে নিজেকেও অতিথির কাছে সমর্পণ করে । কেননা, অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কেউ নেই। একদিন তার আদেশের সততা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর অনুপস্থিতকালে যমরাজ স্বয়ং ব্রাহ্মণবেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে ওঘাবতীর সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করেন। ওঘাবতী তার সঙ্গে যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হয়। এই সময় সুদর্শন ঘরে ফিরে এসে। স্ত্রীকে সামনে দেখতে না পেয়ে তাকে বারবার ডাকতে থাকেন । কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না । কেননা ওঘাবতী তখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে যৌনমিলনে নিযুক্ত থাকায় নিজেকে অশুচি জ্ঞান করে স্বামীর আহবানে সাড়া দেন নি । এমন সময় অতিথি ব্রাহ্মণ ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সুদর্শনকে বলেন যে ওঘাবতী তার কামনা পূর্ণ করেছে। ওঘাবতীর অতিথিপরায়ণতা দেখে সুদর্শন অত্যন্ত প্রীত হন । ধর্ম তখন আত্মপ্রকাশ করে বলে –'সুদর্শন তুমি তোমার সততার জন্য এখন থেকে মৃত্যুকে জয় করলে ।'

মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত উদ্দালক-শ্বেতকেতু কাহিনী থেকেও আমরা প্রাচীন ভারতে অতিথির সঙ্গে যৌন মিলনের নিদর্শন পাই। ওই কাহিনীর মধ্যে উদ্দালক বলেছিলেন–

'স্ত্রীলোক গাভীদের মত স্বাধীন। সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তাদের অধর্ম হয় না–এটাই সনাতন ধর্ম ।'

।। দশ ।।

স্ত্রীকে অপরের হাতে সমর্পণ করা যে প্রাচীনকালে হিন্দু সমাজেই প্রচলিত ছিল, তা নয় । বর্তমানকালে আদিবাসী সমাজেও কোথাও কোথাও এ প্রথা প্রচলিত আছে । যেমন মধ্যপ্রদেশের সাথিয়া উপজাতির মধ্যে কোনও চুক্তির শর্ত হিসাবে বা ঋণের জামিন স্বরূপ উত্তমর্ণের কাছে নিজের স্ত্রী, কন্যা বা অপর কোন আত্মীয়াকে বন্ধক, রাখা যায়। ঋণ পরিশোধ বা চুক্তির শর্ত প্রতিপালন না হওয়া পর্যন্ত ওই স্ত্রী বা কন্যা পাওনাদারের গৃহে থাকে । বন্ধকী অস্থাবর সম্পত্তি ভোগদখল করবার যেমন উত্তমর্ণের অধিকার থাকে, এক্ষেত্রে ওই বন্ধকী স্ত্রী বা কন্যাকে উপভোগ করবার সম্পূর্ণ অধিকারও পাওনাদারের থাকে । এই অবস্থায় ওই পাওনাদারের স্ত্রী বা কন্যাকে উপভোগ করবার সম্পূর্ণ অধিকারও পাওনাদারদের থাকে । এই অবস্থায় ওই পাওনাদারের গৃহে স্ত্রী বা কন্যা যদি সন্তানবতী হয়, তা হলে সে নিজগৃহে পুনরায় ফিরে আসবার সময় ওই সন্তানকে পাওনাদারের গৃহে রেখে আসে। (তুলনা করুন তারা বৃহস্পতির গৃহে ফিরে অন্যাসবার আগে চন্দ্রের ঔরসে জাত সন্তানকে চন্দ্রের গৃহে রেখে এসেছিল) । সাথিয়ারা স্ত্রী বা কন্যাকে বন্ধক রাখা মোটেই লজ্জাজনক বা নীতিবিগর্হিত ব্যাপার বলে মনে করে না।

।। এগার ।।

হিন্দুসমাজে ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলনের অনুমোদন আছে। তান্ত্রিক সাধনার মূলকথা হচ্ছে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন । এই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনকে তন্ত্রশাস্ত্রে গুহ্যরূপ দেওয়া হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ 'ম'-কার সহকারে চক্রপূজার ব্যবস্থা আছে। পঞ্চ 'ম'-কার হচ্ছে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। তন্ত্রপূজার এগুলি হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। তন্ত্রে শক্তিসাধনা বা কুলপূজার ওপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। কোন স্ত্রীলোককে শক্তির প্রতীক ধরে নিয়ে তার সঙ্গে যৌন মিলনে রত থাকাই তান্ত্রিক সাধনার মূলতত্ত্ব। গুপ্তসংহিতায় বলা হয়েছে যে সে ব্যক্তি পামর যে ব্যক্তি শক্তিসাধনার সময় কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মৈথুন ক্রিয়ায় নিজেকে না নিযুক্ত রাখে । নিরুক্ততন্ত্র এবং অন্যান্য অনেক তন্ত্রে বলা হয়েছে যে শক্তিসাধক কুলপূজা হতে কোনরূপ পুণ্যফল পায় না, যদি না সে কোন বিবাহিত নারীর সহিত যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হয় । এ কথাও বলা হয়েছে যে, কুলপূজার জন্য কোন নারী যদি সাময়িকভাবে স্বামীকে পরিহার করে তবে তার কোন পাপ হয় না । সমাজের দৃষ্টিতে যাকে অজাচার বলা হয়, অনেক সময় এটা সে রূপও ধারণ করত। কেননা কুলচুড়মণিতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, অন্য রমনী যদি না আসে তা হলো নিজের কন্যা বা কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ ভগিনী, মাতুলানী মাতা বা বিমাতাকে নিয়েও কুলপূজা করবে। ("অন্যা যদি ন গচ্ছেতু নিজকন্যা নিজানুজা । অগ্রজা মাতুলানী বা মাতা বা তসপত্নীকা। পূর্বাভাবে পরা পূজ্যা মদংশা যোষিতো মতাঃ।। একা চেৎ কুলশাস্ত্রজ্ঞ পুজার্েহা তত্র ভৈরব ।।") .

অনেক সময় ধর্মের রূপ দিয়ে কামাচারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বিবাহিতা নারীকে প্রলুব্ধ করত, তাদের সতীত্ব বিসর্জন দিত । এরূপভাবে প্রলুব্ধ হয়ে সতীত্ব বিসর্জন দেবার এক কাহিনী অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্যটক আবে দুবোয়া তার গ্রন্থে বিবৃত করে গেছেন । তিনি বলেছেন যে দক্ষিণ ভারতে এমন কতকগুলি মন্দির আছে যেখানকার পুরোহিতগণ প্রচার করে যে আরাধ্য দেবতার অত্যাশ্চর্য শক্তি আছে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যতা দূর করবার। এরূপ মন্দিরের মধ্যে কর্নাটক দেশের তিরুপতির মন্দির বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ । এখানকার দেবতা ভেন কাটেশ্বরের কাছে অসংখ্য স্ত্রীলোক আসে সন্তান কামনায় । পুরোহিতগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তারা মন্দিরে রাত্রি যাপন করে। পুরোহিতগণ তাদের বলে যে তাদের ভক্তিদ্বারা গ্রীত হয়ে ভেনকাটেশ্বর রাত্রিকালে তাদের কাছে আসবে এবং তাদের গর্ভবতী করে দিয়ে যাবে। তারপর যা ঘটতে, তা না বলাই ভাল। পাঠক তা সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন । পরদিন প্রভাতে এই সকল জঘন্য চরিত্রের ভণ্ড তপস্বীরা কিছুই জানে না। এরূপ ভান করে ওই সকল স্ত্রীলোকের কাছে এসে দেবতার করুণা লাভ করেছে বলে তাদের পুন্যবতী আখ্যা দিয়ে তাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করত । দেবতার সঙ্গে তাদের যৌন মিলন ঘটেছে, এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এই সকল হতভাগিনী নারীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেত ।

ধর্মানুষ্ঠানের নামে বিবাহিতা মেয়ের সতীত্ব সর্বপ্রথম নাশ করবার অধিকার কুলগুরুদের বাঙলা দেশেও ছিল । একে 'গুরুপ্রসাদী' বলা হত। এ প্রথা ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডেও ছিল । এ প্রথাকে বলা হত – 'Jus prima noctis,' উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে এই প্রথার কি ভাবে অবলুপ্তি ঘটেছিল, তার একটা সজীব চিত্র হুতোম তাঁর নকশায়

দিয়েছেন । তিনি লিখছেন — চক্রবর্তীদের জামাই হরহরি বাবু সেই যে বিয়ের সময় স্ত্রীকে দেখেছিলেন আর দেখেন নি। পাঁচ বৎসর পর তিনি শ্বশুরবাড়ী এসেছেন । এবার হুতোমের ভাষায় বর্ণনাটা শুনুন । এদিকে চক্রবর্তী বাড়ীর গিন্নীরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, 'তাই তো গা ! জামাই এসেছেন, মেয়েও ষেটের কোলে বছর পনেরো হল, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক'। সুতরাং চক্রবর্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির করে প্রভুর বাড়ি খবর দিলে, প্রভু তুরী, খন্তি ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরুপ্রসাদীর আয়োজন হতে লাগল।...চক্রবর্তীর বাড়ীর ভিতর বড় ধুম । গোস্বামী বরের সজ্জা করে জামাইবাবুর শোবার ঘরে শুলেন । হরহরিবাবুর স্ত্রী নানালঙ্কার পরে ঘরে ঢুকলেন । মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মারতে লাগল।...হরহরিবাবু একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন ; এক্ষণে দেখলেন যে স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটা প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। প্রভু খাট থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গেলেন । কন্যাটি কি করে । বংশপরম্পরানুগত ধর্মের অন্যথা করলে মহাপাপ–এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি করল না–সুড়সুড়ি করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলে। প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, 'ব'ল, আমি রাধা তুমি শ্যাম' । কন্যাটিও অনুমতি মত 'আমি রাধা, তুমি শ্যাম', তিনবার বলেছে এমন সময় হরহরিবাবু আর থাকতে পারলেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে এই 'কাঁধে বাড়ি বলরাম' বলে গোস্বামীকে রুলসই করতে লাগলেন । এই ঘটনায় প্রভুরা ভীত হলে সমাজে গুরুপ্রসাদী উঠে গেল। খরতাল বাজাবে ; গোস্বামীর রুল সইয়ের চিৎকারে তার হরিধ্বনি ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগল, মেয়ের উলু দিতে লাগল, কাঁসির ঘণ্টা

শাকের শব্দে হুলস্থুল পড়ে গেল। হরহরিবাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বলল। এদিকে সকলে ঘরে গিয়ে দ্যাখে যে গোস্বামীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাছে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, বিছানায় রক্তের নদী বইছে। সেই অবধি গুরুপ্রসাদী উঠে গ্যালো, লোকেরও চৈতন্য হলো ; প্রভুরাও ভয় পেলেন।

শিব সংযমী দেবতা

ইন্দ্র থেকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু পর্যন্ত সকলেই ব্যভিচারী দেবতা । একমাত্র শিবই ব্যভিচারী বা কামুক দেবতা নন । বরং তার কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি কামদেবকে ভস্ম করেছিলেন । শিব মহাযোগী। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিব ঘোর সংসারী ।

বাঙলার লোকের কাছে শিব অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা । বাঙলার লোক লিঙ্গরূপেই শিবকে পূজা করে থাকে। এই লিঙ্গরূপে পূজা করার মধ্যেই শিবের আদিম ইতিহাস নিহিত । শিব জৈবিক-সৃজন শক্তিভিত্তিক কৃষি দেবতা । আর্যরা এদেশে আসবার অনেক আগে থেকেই এদেশের লোক শিবের পূজা করত। শিব ও শক্তির পূজা একসঙ্গেই হত । কিভাবে শিবশক্তি পূজার উদ্ভব হল, তার ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে বলে নিই।

আদিম মানুষ যখন খাদ্য-আহরণের জন্য পশুশিকারে বেরুত, তখন অনেক সময় তাদের ফিরতে দেরি হত । মেয়েরা তখন ক্ষুধার তাড়নায় গাছের ফল এবং ফলাভাবে বন্য অবস্থায় উৎপন্ন খাদ্যশস্য খেয়ে প্রাণ ধারণ করত । তারপর তাদের ভাবনা চিন্তায় স্থান পায় এক কল্পনা । সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া তাদের জানাই ছিল। যেহেতু ভূমি বন্য অবস্থায় শস্য উৎপাদন করে, সেই হেতু ভূমিকে তারা মাতৃরূপে কল্পনা করে নেয়। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা ভাবতে থাকে। পুরুষ যদি নারীরূপ ভূমি (আমাদের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই মেয়েদের ‘ক্ষেত্র’ বা ভূমি বলে বর্ণনা করা হয়েছে) কর্ষণ করে সন্তান

উৎপাদন করতে পারে, তবে মাতৃরূপ পৃথিবীকে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করা যাবে না কেন ? তখন তারা পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ এক যষ্টি বানিয়ে নিয়ে ভূমিকর্ষণ করতে থাকে। প্রৎমুলুসকি তাঁর 'আর্য ভাষায় অনার্য শব্দ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে 'লিঙ্গ', 'লাঙ্গুল'' ও 'লাঙ্গল', এই তিনটা শব্দ একই ধাতুরূপ থেকে উৎপন্ন । মেয়েরা এইভাবে ভূমিকর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করল । যখন ফসলে মাঠ ভরে গেল, তখন পুরুষরা তা দেখে অবাক হল। চিন্তা করল লিঙ্গরূপী যষ্টি হচ্ছে passive, আর ভূমিরূপী পৃথিবী ও তাদের মেয়েরা হচ্ছে active. Active মানেই হচ্ছে শক্তির আধার । ফসল তোলার পর যে প্রথম নবান্ন উৎসব হল সেই উৎসবেই জন্ম নিল লিঙ্গ ও ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা । এই আদিম ধারনা হতেই উদ্ভূত হয়েছিল শিব ও শক্তির কল্পনা । শিব ও শক্তির আরাধনা মোটেই বৈদিক উপাসনা পদ্ধতির অন্তভূক্ত ছিল না। আর্যরা এদেশে আসবার পরে শিব ও শিবানীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আর্যদেবতামণ্ডলীতে। তবে শিবানীর অনুপ্রবেশের পূর্বেই শিবের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তখন আর্যর শিবকে রুদ্রের সঙ্গে সমীকরণ করে নিয়েছিল ; মনে হয় অনার্য শিব থেকেই আর্যরা রুদ্রের কল্পনা করেছিল । কেননা সংস্কৃতে 'রুদ্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে রক্তবর্ণ, এবং দ্রাবিড় ভাষাতেও 'শিব' শব্দের মানে হচ্ছে রক্তবর্ণ। বৈদিক রুদ্র যে আর্যদের একজন অর্বাচীন দেবতা ছিলেন, তা বুঝতে পারা যায় এই থেকে যে সমগ্র ঋগ্বেদে তঁর উদ্দেশ্যে মাত্র তিনটি স্তোত্র রচিত হয়েছিল। তাছাড়া, বৈদিক অন্যান্য দেবতাদের অসুরদের সঙ্গে বিরোধিতা করতে দেখা যায় । কিন্তু রুদ্রকে কখনও বিরোধিতা করতে দেখা যায় না । এটা থেকেই প্রমাণ হয় যে রুদ্র বা শিব প্রথমে অসুরদেরই দেবতা ছিলেন । শতপথব্রাহ্মণ (১।৭।৩।১১) থেকেও আমরা

জানতে পারি যে দেবতারা যখন স্বর্গে যান, তখন তাদের সঙ্গে শিব ছিলেন না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে

সমুদ্রমন্থনের যে কাহিনী আছে, সে কাহিনী অনুযায়ীও রুদ্র-শিব অন্য দেবতাদের দলে ছিলেন না ।

।। দুই ।।

রুদ্র-শিব গোড়াতে বৈদিক দেবতামণ্ডলীতে ছিলেন না বলেই, তিনি অন্যান্য বৈদিক দেবতাদের মত কামাসক্ত নন। শিব মহাযোগী। তার মনে কামের ভাব জাগাবার জন্য কামদেবকে পাঠাতে হয়েছিল, কিন্তু মহাদেব কর্তৃক কামদেব ভস্মীভূত হয়েছিল (মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী কামদেব ব্রহ্মার হৃদয় হতে উৎপন্ন । কিন্তু ব্রহ্মা নিজে তার শরে জর্জরিত হয়ে নিজ কন্যা শতরূপাতে উপগত হওয়ার দরুণ, ব্রহ্মা কামদেবের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে, তিনি মহাদেব কর্তৃক ভস্মীভূত হবেন। এখানে আরও উল্লেখনীয় যে বিষ্ণু আর্য দেবতা । সেই কারণে আমরা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়কেই ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখি । শিবকে নয় । কোন নারীরই ক্ষমতা ছিল না শিবের রেতঃ ধারণ করবার । এটা আমরা স্কন্দের (কার্তিকের) জন্ম বিবরণ থেকে জানতে পারি। শিব লিঙ্গরূপে পূজিত হলেও (শিবের লিঙ্গচ্ছেদের বিবরণ 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ'-এ আছে) এটাই হচ্ছে শিবের

বৈশিষ্ট্য। সেজন্যই যারা শিবের গাজন উৎসবের ব্রত পালন করে, তারা সারা চৈত্র মাস সন্ন্যাস গ্রহণ করে ও ব্রহ্মচর্য পালন করে ।

।। তিন ।।

শিবের মত জনপ্রিয় দেবতা বাঙলায় আর দ্বিতীয় নেই। সে জন্যই বাঙালী ধান ভানতেও শিবের গীত গায়। বাঙলায় শিবমন্দিরের যত ছড়াছড়ি এ রকম ভারতের আর কোথাও নেই । আর শিবজায়া শিবানীর উৎসবই হচ্ছে বাঙলার শ্রেষ্ঠ উৎসব।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত ছোট ছোট বাঙালী মেয়েরা যখন বোশেখ মাসে শিবপূজা করত তখন ওই পূজার ছড়া-মন্ত্রে স্বগতোক্তি করত-'গৌরী কি ব্রত করে ?' ব্রতের শেষে প্রার্থনা করত–'যেন শিবের মত বর পাই ।' তখন বাঙলার প্রতি মেয়েই কল্পিত হত গৌরী হিসাবে । আর শিব ছিল বাঙালীর কাছে জামাই বিশেষ ।

শিবকে বাঙালী ঘরের মানুষ করে নিয়েছিল । বাঙালী নিজে ছিল কৃষক। সেজন্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিবও হয়েছিল কৃষক । এটাই ছিল কবির কাছে ঘরের জামাই শিব সন্মন্ধে স্বাভাবিক কল্পনা !

উর্বর পলি মাটির দেশ বাঙলা ছিল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা । তার কৃষিসম্পদ ছিল জগৎবিখ্যাত । কৃষি ও কৃষক ছাড়া বাঙালীর কাছে গৌরবের বিষয় আর কিছুই ছিল না । সেজন্য কবিদের কাছে শিব ছিল কৃষক, আর কবিরা ছিলেন কৃষকের কবি ।

শূন্যপুরাণের রামাই পণ্ডিত থেকে শুরু করে শিবায়নের রামেশ্বর পর্যন্ত অসংখ্য-কবি শিবের চাষ করার বর্ণনা দিয়ে গেছেন । এ সব কবির মধ্যে ছিলেন–বিনয়লক্ষ্মণ, কবি শঙ্কর, রতিদেব ও রামরাজা, শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় দাস, জীবন মৈত্র, সহদেব চক্রবর্তী, দ্বিজ কালিদাস, কবি ষষ্ঠীবর, দ্বিজ ভগীরথী, দ্বিজ নিত্যানন্দ, দ্বিজ রামচন্দ্র রাজ, পৃথ্বীচন্দ্র, কবি কৃষ্ণদাস, প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় ও হরিচরণ আচার্য ।

শিব ঠাকুরকে নিয়ে যে কাব্য রচনা করা হত, তাকে 'শিবায়ন' বলা হত । অনেকে আবার এগুলিকে শিব-সংকীর্তন বলতেন । যতগুলি শিবায়ন রচিত হয়েছিল তার মধ্যে রামেশ্বরের শিবায়নই প্রসিদ্ধ ।

রামেশ্বরের শিব হচ্ছে বাঙালীর নিজস্ব কল্পনা । পৌরাণিক কল্পনা অনুযায়ী শিব মহাদেব । তার মানে শিবের স্থান দেবতাদের পুরোভাগে । কিন্তু গোড়াতে শিব ছিলেন অবৈদিক দেবতা । শুধু অবৈদিক দেবতা নন, তিনি প্রাগ্‌বৈদিক দেবতা। শিবের প্রতীকের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় প্রাগ্‌বৈদিক সিন্ধু সভ্যতায় । সেখানে আমরা মৃগ, হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, মহিষ বেষ্টিত যোগাসনে উপবিষ্ট উর্দ্ধলিঙ্গ পশুপতি শিবকে এক সীলমোহরের ওপর মুদ্রিত দেখি । তাঁর উপাসকদের মধ্যে ছিল অবৈদিক জাতিগণ–যেমন অসুর,

রাক্ষস ইত্যাদি । অসুররাজ বাণ তাঁর পরম ভক্ত ছিল । অনুরূপভাবে লঙ্কেশ্বর রাক্ষসরাজ রাবণও তাঁর পরম ভক্ত ছিল । প্রাগার্য বা অনার্য বলেই বৈদিক যাগযজ্ঞে শিবের হবির্ভাগ ছিল না । দক্ষ এই কারণেই তাঁর যজ্ঞে শিবকে আমন্ত্রণ জানান নি । শিব এই যজ্ঞ পণ্ড করবার পরই, শিব আর্যসমাজে স্বীকৃতি লাভ করে । সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিয়ামক হিসাবে দেবাদিদেব শিবের স্বীকৃতি দানে সেদিন সহায়ক হয়েছিলেন বিষ্ণু ।

দক্ষযজ্ঞের পর শিবজায়া সতী হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন । তখন মহাদেবও কঠোর তসস্যায় রত ছিলেন। এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতারা জানতে পারেন যে, মহাদেবের ঔরসে যে পুত্র জন্মাবে সেই পুত্রই তারকাসুরকে বধ করবে। সেজন্য পার্বতী ও মহাদেবের মিলন করাতে এসে কামদেব বা মদন মহাদেবের কোপে ভস্মীভূত হয়। তারপর পার্বতী ও মহাদেবের মিলন হলে মদন পুনর্জীবন লাভ করে। এই মিলনের ফলে কার্তিকের জন্ম হয় । কার্তিককে দেবসেনাপতি করা হয়। কার্তিক তারকাসুরকে বধ করেন । মহাভারতে আছে যে ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে পিশাচ পর্যন্ত সকলেই মহাদেবকে পূজা করেন। একবার ব্রহ্মা মহাদেবকে অসম্মানসূচক কথা বলেছিলেন বলে মহাদেব ব্রহ্মার একটি মস্তক কর্তন করেন । সেই থেকে, ব্রহ্মা চতুর্মুখ। আগে ব্রহ্মার পাঁচ মুখ ছিল। শিবই একটা মুখ কেটে দিয়েছেন।

শিবের নিবাস কৈলাসে। তাঁর তিন স্ত্রী সতী, পার্বতী ও গঙ্গা । দুইপুত্র কার্তিক ও গণেশ। দুই কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী। বিষ্ণু শিবের জামাতা । শিবের অনুচরদের মধ্যে আছে নন্দী ও ভৃঙ্গী ।

শিব অত্যন্ত সংযমী দেবতা । আর্যদেবতামণ্ডলীর দেবতাগণের মত শিব কামপরায়ণ নয় । ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম যখন তিলোত্তমা নামে এক অপরূপ সুন্দরী নারী সৃষ্টি করেছিল, তখন তিলোত্তমাকে দেখার জন্য ব্রহ্মার চারিদিকে চারিটি মুখ নির্গত হয়েছিল ও ইন্দ্রের সহস্র নয়ন হয়েছিল । একমাত্র শিবই তখন স্থির হয়ে বসেছিলেন । সেইজন্য শিবের আর এক নাম স্থানু ।

গায়ক হিসাবে শিবের সুনাম ছিল। সঙ্গীত বিদ্যায় তিনি নারদকেও পরাহত করেছিলেন । শিবের সঙ্গীতের শ্রোতা ছিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু।

মহাদেবের তৃতীয় নেত্র উদ্ভব সম্বন্ধে পুরাণে আছে যে পার্বতী একবার পরিহাসছলে মহাদেবের দুই নেত্রী হস্তদ্বারা আবৃত করেন । তখন সমস্ত পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন ও আলোকবিহীন হয়। তাতে পৃথিবীর সব মানুষ বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। পৃথিবীর লোকদের রক্ষা করবার জন্য তিনি ললাটে তৃতীয় নেত্র উদ্ভব করেন ।

ললাটে তৃতীয় নেত্র উদ্ভবের কাহিনী থেকেই আমরা শিবের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাই। পৌরাণিক যুগের তিন শ্রেষ্ঠ দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিনের মধ্যে শিবই

হচ্ছেন সংহারকর্তা । কিন্তু শিব মাত্র সংহারকর্তা নন। সংহারের পর তিনি আবার জীব সৃষ্টি করেন । আমরা আগেই বলেছি যে শিব গোড়াতে সৃজনশক্তিরই দেবতা ছিলেন । সৃজনের জন্য প্রয়োজন হয় প্রজনন । প্রজনন একটা জৈবিক প্রক্রিয়া । এই জৈবিক প্রক্রিয়ার প্রতীক হচ্ছে গৌরীপট্টের মধ্যে স্থাপিত শিবলিঙ্গ । শিবের এই রূপই হচ্ছে একটা মহান বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকাশ । এর মধ্যে চিত্তবিকারজনিত কোন ব্যাপার নেই।

শিবের যৌনজীবনের এক রমণীয় চিত্র আমরা রামেশ্বরের শিবায়ন-এ পাই । রামেশ্বরের শিব একেবারে বাঙলার ঘরের মানুষ । রামেশ্বরের শিবানী দুলের মেয়ে । সুতরাং বিবাহসূত্রে শিবও দু'লে– বাঙলার নিম্নকোটির লোক । বেদের সময় শিব ছিলেন অনার্য দেবতা । এই কাব্যেও শিব হয়েছেন সেকালের বাঙলার ওই ধরনের শ্রেণীর প্রতীক । বাঙলার নিম্নকোটির আর পাঁচজন লোকের মত, রামেশ্বরের শিবও নিঃস্ব । ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া, তার আর কোন উপজীব্য নেই। ভিক্ষায় বেরিয়ে শিব কুচনীপাড়ায় গিয়ে কুচনীদের সঙ্গে প্রেম করে । দিনের শেষে ভিক্ষা করে যা নিয়ে আসে, তুই ছেলে কার্তিক, গণেশ তা খেয়ে ফেলে। কিন্তু কার্তিকের ছয় মুখ আর গজাননের সুবৃহৎ উদার । তাদের ক্ষুধিত উদর কখনই পূর্ণ হয় না। গৃহিণী নিজেও সর্বদা ক্ষুধিতা । উদাসীন স্বামীকে নিয়ে গৌরীর খুবই বিড়ম্বনা । গৌরী স্বামীকে বলেন–'তোমার এত অভাব । এত অনটন। কোনদিন তোমায় দুটি ভাত দিতে পারি, আবার কোনদিন তা-ও পারি না । তোমার এত দুঃখ আমি দেখতে পারি না । তুমি চাষ কর । তোমার গৃহে অন্নের অভাব হবে না । যেভাবে চাষ করতে হবে, তা আমি বলে দিচ্ছি। পুকুরের ধারে জমি নেবে যাতে জলের অভাবে তুমি পুকুর থেকে জল সেঁচে আনতে পার । ফসল হলে, তুমি নিজের ঘরের

ভাত কত সুখে খাবে । আরও, তোমাকে আর সব সময় কেঁদো বাঘের ছাল পরে থাকতে হবে না । তুমি কার্পাসের চাষ করে, তুলা বের কর । তা থেকে তোমার পরবার কাপড়ও তৈরী হবে ।' এ যেন আত্মভোলা মহাবোধিকে কর্মযোগে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । শিব গৌরীর পরামর্শে চাষী হন। নিজের ত্রিশূলের মাথা কেটে লাঙ্গলের ফলা তৈরী করান। ইন্দ্রের কাছ থেকে জমি সংগ্রহ করেন, কুবেরের কাছ থেকে ধানের বীজ। আর হলকর্ষণের জন্য নিজের বৃষ তো আছেই। তাছাড়া, যমের কাছ থেকে মহিষও চেয়ে নেন । তারপর রামেশ্বরের ভাষায়— 'মান্য জান্য মঘবান মহেশের লীলা । মহীতলে মাঘ শেষে মেঘরস দিলা ॥' এ তো সেই বাঙলার চাষীর মুখে ডাকের বচনেরই প্রতিধ্বনি - "ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।'

তারপর শুভদিনে শিব ক্ষেতের কাজ আরম্ভ করলেন । জমি চৌরস করলেন, আল বাঁধলেন। বীজ বপন করলেন । বীজগুলি বেরুল । বর্ষার জল পেয়ে ধানের পাশে আরও নানারকম গাছপালা জন্মাল । তখন শিব নিড়ানের কাজ আরম্ভ করলেন । বর্ষার সঙ্গে জোক মশা মাছির উপদ্রব বাড়ল । কিন্তু তা-বলে তো কাতর হয়ে চাষী চাষ বন্ধ রাখে না । শিবও বিরত হন না । ধানগাছের মূলটুকু ভিজা থাকবে, এমন জল রেখে বাকী জল নালা কেটে, ভাদ্র মাসে ক্ষেত থেকে বের করে দেন। আবার আশ্বিন-কার্তিকে ক্ষেতের জল বাঁধেন । এর মধ্যে ডাক সংক্রান্তি এসে পড়ে । শিব ক্ষেতে নল পুতেন। দেখতে দেখতে সোনালী রঙের ধান দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। শিবের আনন্দ ধরে না । দেখতে দেখতে পৌষ মাসে ধান কাটার সময় আসে। শাখ বাজিয়ে গৌরী ধান ঘরে

তুললেন । সব শেষে রামেশ্বর দিয়েছেন বাঙালী কৃষক গৃহস্থের মত নবান্নে ও পৌষ পার্বণে শিবের দুই ছেলের সঙ্গে ভোজনের এক মধুময় আনন্দচিত্র।

রামেশ্বরের শিবায়নে দেবতারা মানুষ । ব্রহ্মার গায়ে গা দিয়ে বসে গোপকন্যা । শিব-গৌরীও কৈলাসের শিব-গৌরী নন । তঁরা বাঙলার কৃষক ও কৃষকগৃহিণী, বাঙালী তার দেবতাদের মানুষ ও মানুষীর রূপ দিয়ে তঁদের আপনজন করে নিয়েছিল । আর পাঁচটা বাঙালী মেয়ের মত গৌরী পুতুল খেলা করে । পুতুলের বিয়ে দেয় নিজের । পুতুলের বিয়েতে নিজের সখীদের বিকল্প ভোজন করায় । অন্য বাঙালী মেয়ের মত গৌরীর বিয়েতেও ঘটকের প্রয়োজন হয় । ভাগনে নারদই মামার বিয়ের ঘটকালী করে । বিয়েতে পালনীয় সব কর্মই অনুষ্ঠিত হয় । এয়োরা আসে, কন্যা সম্প্রদান হয়, যৌতুকও বাদ যায় না । রামেশ্বর এয়োদের যে নামের তালিকা দিয়েছেন তা থেকে আমরা তৎকালীন মেয়েদের নামের নমুনা পাই। তবে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে যেমন কবিরা পতি নিন্দার অবতারণা করেছেন, রামেশ্বর তা করেন নি। তার পরিবর্তে তিনি শাশুড়ীদের মুখ দিয়ে জামাতাদের নিন্দা প্রকাশ করেছেন । রামেশ্বরের কাব্যের এই অংশ অত্যন্ত কৌতুকাবহ ।

অন্য কৃষকপত্নীদের মত গৌরীও শিবঠাকুরকে খাবার দিতে মাঠে যায়। গৌরীকে দেখে শিবঠাকুর হাল ছেড়ে দিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন—'কি গো খাবার আনতে এত দেরী কেন ?' গৌরী বলে— 'ছেলেপুলের সংসার এক হাতে সব করতে গেলে এমনই হবে।' কথায় কথা বাড়ে। ক্ষুধিত শিব গৌরীর চুল ধরে টানে। এটা অবশ্য রামেশ্বরের শিবায়নে

নেই। আছে ওড়িয়া সাহিত্যে । তবে বাঙালী গৃহস্থ ঘরে স্বামী-স্ত্রীর কোন্দলের অনুসরণ করে। রামেশ্বর তার শিবায়নে হর-গৌরীর ঝগড়ার বর্ণনা দিয়েছেন । শিব রাগ করে গৌরীকে বলে–'ক্ষেমা কর ক্ষেমঙ্করি খাব নাঞি ভাত । যাব নাঞিঃ ভিক্ষায় যা করে জগন্নাথ ।' আবার অন্য সময় শিব আদর করে গৌরীর হাতে শাখাও পরিয়ে দেন ।

রামেশ্বর অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন গৌরীর স্বামী-পুত্রকে খাওয়ানোর–

'তিন ব্যক্তি ভোক্তা এক অন্ন দেন সতী ।
দুটি সুতে সপ্তমুখ, পঞ্চমুখ পতি ॥
তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এল নাঞি হাঁড়ি পানে চায় ॥
সুক্ত খায়্যা ভোক্তা যদি হস্ত দিল শাকে ।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে ॥
কার্তিক গণেশ বলে অন্ন আন মা ।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হইয়া খা ॥
ঊল্বন চর্বনে ফির্‌্যা ফুরাইল ব্যঞ্জন ।
এককালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন ॥
চটপট পিষিত কর্‌্যা যুষে ।
বাউবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়্যা আসে ॥
চঞ্চল চরণেতে নূপুর বাজে আর ।

রিনি রিনি কিঙ্কিনী কঙ্কণ ঝনকার ॥’

এক কথায় রামেশ্বর শিবকে বাঙলার ঘরের মানুষ ও শিবানীকে বাঙালী ঘরের গৃহিণী করেছেন । বাঙালী ঘরের গৃহিণী হিসাবে গৌরীকে দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়। মা মেনকা গৌরীকে বিশ্রাম দেবার জন্য বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে চান । কিন্তু শিবের মর্যাদাজ্ঞান খুব বেশি । মাত্র তিন দিনের কড়ারে শিব গৌরীকে বাপের বাড়ি পাঠন । সেজন্যই বাঙালী বলে যে শরৎকালে মা মাত্র তিন দিনের জন্য বাপের বাড়ি আসছেন।

রাজমহীষীদের অশ্বসঙ্গম

সৃজনশক্তি উৎপাদনের সঙ্গে জীব-মেধ যজ্ঞের যে একটা নিকট ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তা আমরা বুঝতে পারি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সমূহ থেকে। অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে অনেকেরই কোন সঠিক ধারণা নেই, যদিও পঞ্চাশ বছর পূর্বে আমি 'ইণ্ডিয়ান কালচার' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে লিখেছিলাম । সাধারণের ধারণা যে অশ্বমেধ মাত্র সার্বভৌম নৃপতিগণ দ্বারাই অনুষ্ঠিত হত, তা নয় । আপস্তম্ভ শ্রৌতসূত্র (২০।১।১) অনুযায়ী যিনি সার্বভৌম হননি, তিনিও এ যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারতেন ।

অশ্বমেধ ছিল বৈদিক যুগের সবচেয়ে বড় যজ্ঞ । বৈদিক গ্রন্থসমূহে অশ্বমেধের মহিমা উচ্ছসিত ভাষায় কীর্তিত হয়েছে। ঐতিহাসিক যুগে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ দুবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন । রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরও অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন । শত অশ্বমেধকারী রাজা ইন্দ্রত্ব লাভ করতেন । সেজন্যই ইন্দ্রের এক নাম শতক্রতু। এটা চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হত । কিন্তু কাত্যায়ন তাঁর শ্রৌতসুত্রে (২০।১।২১) বলেছেন যে এটা যে-কোন সময়েও হতে পারত । যজ্ঞের আসল অংশটা তিনদিন স্থায়ী হত, কিন্তু এর প্রস্তুতিপর্ব শেষ করতে এক থেকে দুবছর সময় লগত । এতে অংশ গ্রহণ করতেন রাজা ও তার চার মহিষী, ৪০০ জন পারিষদ ও ৪ জন পুরোহিত । কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (২।১।২১-৩৫) অনুযায়ী প্রাথমিক আচার অনুষ্ঠানের পর এক বৎসরের (এই এক বৎসর তাকে যৌনমিলন থেকে বিরত রাখা হত) জন্য

তাকে দেশের মধ্যে বিচরণ করবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হত । তার সঙ্গে থাকত ৪০০ জন সশস্ত্র প্রহরী ও ১০০ জন রাজারাজড়া বা তাদের ছেলে পুলে । অপর রাজ্যের ভিতর দিয়ে যাবার সময় যদি কেউ অশ্বটি অপহরণ করত বা তার গতি প্রতিহত করত, তা হলে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ হত ও অশ্বটিকে উদ্ধার করা হত । অশ্বটি নির্বিঘ্নে স্বরাজ্যে ফিরে এলে আসল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত ।

প্রথম দিনে এক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করা হত । দ্বিতীয় দিনে যজ্ঞকারী রাজার রাণীরা অশ্বটিকে এক নিকটস্থ জলাশয়ে নিয়ে গিয়ে তার বিলোপন ও প্রসাধনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করত। তারপর অশ্বটিকে যজ্ঞস্থানে ফিরিয়ে এনে, একটি ছাগ ও অন্যান্য বধ্য প্রাণীর সঙ্গে যুপকাষ্ঠে বাঁধা হত। তখন ঘোড়াটাকে সংজ্ঞাপন বা শ্বাসরোধ করে মারা হত ।

তারপর প্রধান রাজমহিষী ঘোড়াটার পাশে শুয়ে পড়ত । তাদের ওপর একখানা কাপড় চাপা দেওয়া হত । কাপড়ের আচ্ছাদনের ভিতরে প্রধান মহিষী ঘোড়াটার সঙ্গে মৈথুন কর্মে নিযুক্ত হত, এবং তাকে যৌনকর্মে উত্তেজিত করবার জন্য বাহিরে দণ্ডায়মান পুরোহিত ও উপস্থিত মেয়েরা নানারকম অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করত। (আপস্তম্ভ শ্রৌতিসূত্র ২০|১৮|৩-৪ ; কাত্যায়ন শ্রেণীতসূত্র ২০|৬|১৫-১৭) । তারপর ঘোড়াটাকে কাটা হত, রান্না করা হত ও বিতরণ করা হত । (নীচে দেখুন) । যজ্ঞের তৃতীয় দিনকে “অতিরাত্র’ বলা হত । ওই দিন ‘অবভূত” অনুষ্ঠানের পর যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটত। অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য চারজন পুরোহিতের প্রত্যেককে দক্ষিণাস্বরূপ ৪৮,০০০ গাভী দান করা হত। (অশ্বমেধ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য পি. ই. ডুমোণ্টের L’ Asvamedha,

Paris 1927 দেখুন)। বাজসনেয়ী সংহিতায় (২২-২৩) অশ্বমেধের যে বিবরণ আছে, তা থেকে মনে হয় যে অশ্বের পরিবর্তে প্রধান পুরোহিতের সাহিতই প্রধান রাজমহিষী সর্বসমক্ষে মৈথুন ক্রিয়ায় রত হতেন ।

অশ্বমেধের রান্না মাংস খাবার জন্য ঋষিদের রসনায় জল গড়াত । ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে (১।১৬২।১১) বলা হয়েছে–"হে অশ্ব ! অগ্নিতে পাক করবার সময় তোমার গা দিয়ে যে রস বেরোয় এবং যে অংশ শূলে আবদ্ধ থাকে, তা যেন মাটিতে না পড়ে ও ঘাসের সঙ্গে না মিশে যায় । দেবতারা লালায়িত হয়েছেন, তাঁদের দেওয়া হোক ।' আবার বলা হয়েছে– 'যে কাষ্ঠদণ্ড মাংস-পাক পরীক্ষার্থে ভাণ্ডে দেওয়া হয়, যে সকল পাত্রে ঝোল রক্ষিত হয়, যে সকল আচ্ছাদন দ্বারা উষ্ণতা রক্ষিত হয়...এরা সকলেই অশ্বের মাংস প্রস্তুত করছে ।' (১।১৬২।১৩) । ঋগ্বেদের এ সকল বর্ণনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, অশ্বের মাংস বেশ রসাল করে ঝোলসহ রান্না করা হত এবং তা ঝলসানোও হত, এবং সে মাংসের জন্য যে মাত্র দেবতাগণই লালায়িত হয়ে উঠতেন তা নয় ; জনসাধারণও সে মাংসের টুকরো পাবার জন্য চারদিকে ভীড় করে থাকত ও রান্নার সুঘ্রাণ গ্রহণ করত। কেননা বলা হয়েছে– 'যারা চারদিক থেকে অশ্বের মাংস রান্না দেখেছে, যারা বলেছে যে গন্ধ মনোরম হয়েছে–এখন নামাও, যারা মাংস পাবার জন্য অপেক্ষা করছে, তাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্কল্প এক হউক । (ঋগ্বেদ ১।১৬২।১২) ।

নারীসঙ্গম ও তন্ত্রধর্ম

হিন্দু ধর্মের এক বিশেষ "ইডিয়াম" হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনা, তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে যাঁরা বামাচারী তাদের নারী সঙ্গমই হচ্ছে সাধনার প্রধান অঙ্গ । কিভাবে ধর্মের সঙ্গে নারী সঙ্গম জড়িত হয়ে পড়েছিল তার বিবরণ নীচে দিচ্ছি।

সকলেরই জানা আছে যে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল ভূমিকর্ষণ নিয়ে। ভূমিকর্ষণই মানুষকে বাধ্য করেছিল স্থায়ী বসবাস স্থাপনে। এই স্থায়ী বসবাস প্রথমে গ্রামের রূপ নিয়েছিল, পরে বিকশিত হয়েছিল নগরে । স্থায়ী বসবাস স্থাপনের পূর্বে মানুষ ছিল যাযাবর প্রাণী। কেননা, তখন পশুমাংসই ছিল তার প্রধান খাদ্য । পশুশিকারের জন্য তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ করতে হত । পশুশিকার ছিল পুরুষের কর্ম। আর ভূমিকর্ষণের সূচনা করেছিল মেয়েরা। পশু শিকারে বেরিয়ে পুরুষের যখন ফিরতে দেরি হত, তখন মেয়ের ক্ষুধার তাড়নায় গাছের ফল (ইভের গাছের ফল খাওয়া তুলনা করুন) এবং ফলাভাবে বন্য অবস্থায় উৎপন্ন খাদ্য শস্য খেয়ে প্রাণধারণ করত । তারপর তাদের ভাবনাচিন্তায় স্থান পায় এক কল্পনা । সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া তাদের জানাই ছিল। যেহেতু ভূমি বন্য অবস্থায় শস্য উৎপাদন করে, সেইহেতু তারা ভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে নেয়। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা ভাবতে থাকে পুরুষ যদি নারীরূপ ভূমি (আমাদের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই মেয়েদের 'ক্ষেত্র' বা "ভূমি" বলে বর্ণনা করা হয়েছে) কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন করতে পারে, তবে মাতৃরূপ পৃথিবীকে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করা যাবে না

কেন ? তখন তারা পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ এক ষষ্টি বানিয়ে নিয়ে ভূমি কর্ষণ করতে থাকে (Przyluski তাঁর "Non-Aryan Loans in Indo Aryans" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে "লিঙ্গ", "লাঙ্গুল" ও "লাঙ্গল" এই তিনটা শব্দ একই ধাতুরূপ থেকে উৎপন্ন) । মেয়েরা এইভাবে ভূমিকর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করল । যখন ফসলে মাঠ ভরে গেল, তখন পুরুষরা তা দেখে অবাক হল। লক্ষ্য করল লিঙ্গপুরী যষ্টি হচ্ছে passive, আর ভূমিরূপী ও তাদের মেয়েরা হচ্ছে active | Active মানেই হচ্ছে শক্তির আধার। ফসল তোলার পর যে প্রথম নবান্ন উৎসব হল সেই উৎসবেই জন্ম নিল লিঙ্গ ও ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা। এ সম্বন্ধে Clodd তার Animism গ্রন্থে বলেছেন :

"In earth worship is to be found the explanation of the mass of rites and ceremonies to ensure fertilisation of the crops and cattle and woman herself." এ থেকে কিভাবে লিঙ্গ ও শক্তিপূজার উদ্ভব হল, সে সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা অবগত হবার জন্য বর্তমান লেখকের "Pre-Aryan Elements in Indian Culture", Calcutta Review 1931 দেখুন।

।। দুই ।।

এই আদিম ধারণা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল শিব ও শক্তির কল্পনা । এবং এদের উপাসনা নিয়েই উদ্ভূত হয়েছিল তন্ত্রধর্ম। সুতরাং তন্ত্রধর্মটা হচ্ছে মূলত এক অতি প্রাচীন ধর্ম, যদিও পরবর্তীকালে এটা বিকশিত হয়েছিল নানারূপে । শিব ও শক্তির আরাধনা মোটেই

বৈদিক উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। লিঙ্গ পূজা নবপলীয় যুগ থেকেই হয়ে এসেছে (লেখকের "Beginnings of Linga Cult in India" in Annals of the Bhandarkar Oriental Institute" 1929 দ্রষ্টব্য) । আর আদি শিব ও মাতৃকাদেবীর পূজার অজস্র নিদর্শন আমরা প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে পেয়েছি। সিন্ধুসভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা । কিন্তু আর্যরা প্রথমে কৃষিকর্ম জানতেন না । এটা শতপথব্রাহ্মণের (২।৩৭-৮) এক উক্তি থেকে প্রকাশ পায় । সেখানে বলা হয়েছে-"প্রথমতঃ দেবতারা একটি মানুষকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করলেন, তার উৎসর্গীকৃত আত্মা অশ্বদেহে প্রবেশ করল। দেবতারা অশ্বকে উৎসর্গ করলেন। উৎসগীকৃত আত্মা অশ্বদেহ হতে পুনরায় বলীবর্দে প্রবেশ করল। বলীবর্দকে উৎসর্গ করা হলে, ওই আত্মা মেষদেহে প্রবিষ্ট হল । মেষ উৎসর্গীকৃত হলে, উহা ছাগদেহে প্রবিষ্ট হল । ছাগ উৎসর্গীকৃত হলে, পৃথিবীতে প্রবেশ করল । দেবতারা পৃথিবী খনন করে গম ও যাব আকারে ওই আত্মাকে পেলেন । তদবধি সকলে শস্যাদি কর্ষণ দ্বারা পেয়ে থাকে।" শতপথব্রাহ্মণের এই বিবরণটি অত্যন্ত অর্থদ্যোতক । এর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় লুক্কায়িত আছে আর্যদের কৃষ্টির ইতিহাস। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে আর্যর প্রথমে ভূমিকর্ষণ দ্বারা শস্যাদি উৎপাদন করতে জানত না । সুতরাং তাদের মধ্যে তন্ত্রধর্মের প্রচলন ছিল না ।

আমি বহুকাল ধরে বহু জায়গায় বলে এসেছি যে আর্যরা যখন এদেশে আসে, তখন তাদের সঙ্গে মেয়েছেলের সংখ্যা ছিল কম । সেজন্য তারা অনার্য রমণীদের বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে', এই বচন অনুযায়ী অনার্য রমণী যখন গৃহিণী হয়ে বসলেন, তখন তিনি ধর্ম সম্বন্ধে আর্য চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করলেন । তখনই শিব ও

শিবানীর অনুপ্রবেশ আর্য দেবতামণ্ডলীতে ঘটল । প্রথমেই শিবের কথা ধরুন । বৈদিক রুদ্রদেবতা যে মহেঞ্জোদারোর আদি শিবের প্রতিরূপেই কল্পিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কেননা ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে রুদ্র সুবর্ণ নির্মিত অলঙ্কার ধারণ করেন, এবং মহেঞ্জোদারোয় আমরা আদি-শিবের যে মূর্তি পেয়েছি, সেখানেও আমরা আদি-শিবকে বাহুতে ও কণ্ঠে অলঙ্কার ধারণ করতে দেখি । বৈদিক রুদ্র যে আর্যদের একজন অর্বাচীন দেবতা ছিলেন, তা বুঝতে পারা যায়। এই থেকে যে, সমগ্র ঋগ্বেদে তাঁর উদ্দেশ্যে মাত্র তিনটি স্তোত্র রচিত হয়েছিল, এবং অগ্নিদেবতার সঙ্গে তাঁর সমীকরণ করা হয়েছিল। আর্যরা যখনই তঁদের দেবতামণ্ডলীতে কোন নূতন দেবতার পত্তন করতেন, তখনই অগ্নির সঙ্গে তাঁর সমীকরণ করে নিতেন । এটা কালী ও করালীর অনুপ্রবেশের সময়ও করা হয়েছিল, অথচ আমরা জানি কালী ও করালী অনার্য দেবতা । এখানে উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃতে 'রুদ্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে রক্তবর্ণ, এবং দ্রাবিড় ভাষাতেও 'শিব' শব্দের মানে হচ্ছে 'রক্তবর্ণ' । এছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে 'শর্ব' ও 'ভব' এই দেবতাদ্বয় প্রাচ্য দেশীয় অসুরগণ ও বাহকগণ কর্তৃক পূজিত হন । কিন্তু বাজসনেয়ী সংহিতায় এ দুটি দেবতা অশনি, পশুপতি, মহাদেব, ঈশান, উগ্রদেব প্রভৃতির সঙ্গে আর্য দেবতামণ্ডলীতে স্থান পেয়ে অগ্নি দেবতার সঙ্গে সমীকৃত হয়েছেন । অগ্নিদেবতার সঙ্গে সমীকরণের ফলে শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যে আমরা হর, মৃন্দ, শর্ব, ভব, মহাদেব, উগ্র, পশুপতি, শঙ্কর, ঈশান-প্রভৃতি দেবতাকে শিবের সঙ্গে অভিন্ন হিসাবে দেখি । বৈদিক রূদ্রাগ্নির উপাসনাই এটাকে সম্ভবপর করেছিল । এ সম্বন্ধে বেরিয়েডেল কীথের একটা মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন- "এ প্রশ্ন মনে উদয় হয় যে বৈদিক যুগের শেষের দিকের রুদ্র দেবতার মধ্যে আমরা একাধিক দেবতার

সমন্বয় ও আর্য মানসিকতার ওপর অনার্য প্রভাব পাই কিনা ? এটা নিশ্চয়ই সম্ভবপর যে কতকগুলি অরণ্য, পর্বত ও কৃষি সংক্রান্ত দেবতা বা মৃতাত্মা সম্পকিত দেবতা বৈদিক রুদ্র দেবতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শিবরূপে কল্পিত হয়েছিল । পরবর্তী কালের শিবের মধ্যে আমরা কৃষি সম্পকিত অনেক ধ্যান-ধারণা লক্ষ্য করি এবং দেখতে পাই যে শিবের লিঙ্গ পূজা যে ঋগ্বেদে নিন্দিত হয়েছে তা হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ জনপ্রিয়, ভারতের আদিবাসিগণের মধ্যেও সেরূপ জনপ্রিয় ” (A.K. Sur. “Pre-Aryan Elements in indian Culture”, Calcutta Review 1931 দ্রষ্টব্য)।

এবার দেবীপূজার কথা বলি। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, প্রভৃতি নগরে দেবীপূজার যে ব্যাপক প্রচলন ছিল, তা মৃন্ময়ী মাতৃকাদেবীর মূর্তিসমূহ থেকে প্রকাশ পায় । পুরুষ দেবগণ কর্তৃক অধিকৃত ঋগ্বেদের দেবতামণ্ডলীতে মাতৃদেবীর কোন স্থান ছিল না । পরবর্তীকালে যখন সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছিল, তখনই প্রাগার্য দেবীসমূহের হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন বৈদিক যুগের অন্তিমে আমরা কালী, করালী প্রভৃতি দেবীর নাম পাই। কিন্তু তখনও তাঁরা তাদের মৌলিক স্বরূপ বা স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে অনুপ্রবেশ করতে পারেন নি। তাঁরা বৈদিক অগ্নি উপাসনারই অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন । কিন্তু আর্যরা যত পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ততই হ্রাস পেতে লাগল। তখন এইসব অনার্য দেবতা বেশ রীতিমত হানা দিয়ে আর্যমণ্ডলীতে তাঁদের আসন করে নিলেন। পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা বিন্ধ্যবাসিনী, পর্ণশবরী প্রভৃতি দেবীকে অনার্যদেবীর স্বরূপেই পাই। তারপর মাতৃপূজা প্রাগার্য তন্ত্রধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রভাবান্বিত করে। (লেখকের ‘সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও অবদান” জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮ দেখুন ।)

।। তিন ॥

অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে যে ব্রাত্যধর্মের বর্ণনা আছে, তা প্রাচ্য ভারতে প্রচলিত তন্ত্রধর্মেরই অনুরূপ কোন ধর্ম। তঁদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য আর্যরা প্রথমে ব্রাত্যদের ঘৃণা করতেন। আর্যরা বলতেন তারা বেদবিহিত কোন যজ্ঞাদি ক্রিয়া করবার অধিকারী নয় । কিন্তু পরে অথর্ববেদের যুগে তাদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। কেননা, অথর্ববেদের সমস্ত পঞ্চদশ কাণ্ডটাকেই ব্রাত্যমহিমা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে— "ব্রাত্য পুরুষ মহানুভব, দেবপ্রিয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তেজের মূল, অধিক কি ব্রাত্য পুরুষ দেবাদিদেব।" ব্রাত্যধর্মের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর অনেক উপাদানই তন্ত্রধর্মের উপাদান । এটাই প্রাচ্যভারতের ধর্ম ছিল । অন্যত্র আমি উল্লেখ করেছি যে বৈদিক আর্যদের (Nordics) এদেশে আসবার পূর্বে আর এক আর্যভাষাভাষী দল (Alpines) এদেশে এসেছিল । তাদের আদি পিতৃভূমিতে দুই দলের মধ্যে বিরোধ ঘটার দরুণ, শেষোক্ত দল নিজ পিতৃভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল । এরা (Alpines) ছিল কৃষিজীবীর দল, আর অপররা (Nordics) ছিল পশুশিকারীর দল । সুতরাং কৃষিপরায়ণ ছিল বলেই এদের মধ্যে শক্তিপূজার প্রচলন ছিল । আমি আমার "বাঙলার সামাজিক ইতিহাস"-এ বলেছি যে এরা শেষ পর্যন্ত বাঙলা দেশে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। বাঙলা দেশে এসে যখন তারা পৌঁছেছিল তখন তাদের সেখানে সাক্ষাৎ হয়েছিল অপর এক কৃষিপরায়ণ জাতির সঙ্গে, যাদের মধ্যেও মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। (আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯৭৯ সালের বার্ষিক সংখ্যায় লেখকের 'বাঙলা কি সভ্যতার

জন্মভূমি' প্রবন্ধ দেখুন)। সান্নিধ্যে থাকার দরুন পরস্পরের মধ্যে যে মাত্র রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল (লেখকের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়", জিজ্ঞাসা, দেখুন) তা নয়, তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণও ঘটেছিল। এই সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের যুগেই তান্ত্রিক ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল ।

।। চার ।।

তন্ত্রধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। হিন্দুরা বলেন যে, তন্ত্রধর্মের বীজ বৈদিক ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল। আর, বৌদ্ধরা দাবী করেন যে, তন্ত্রের মূল ধারণাগুলি ভগবান বুদ্ধ যে সকল, মুদ্রা, মন্ত্র মণ্ডল, ধারণা, যোগ প্রভৃতির প্রবর্তন করেছিলেন তা থেকেই উদ্ভূত। মনে হয় তন্ত্রধর্মের আসল উৎপত্তি সম্মন্ধে সূত্রকৃতঙ্গ' নামে এক প্রাচীন জৈনগ্রন্থ বিশেষ আলোকপাত করে । এটা সকলেরই জানা আছে যে, তন্ত্রের আচার-অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি অত্যন্ত গূঢ় এবং উক্ত প্রাচীন জৈনগ্রন্থ অনুযায়ী গূঢ় সাধন পদ্ধতি শবর, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ ও গৌড় দেশবাসীদের এবং গন্ধর্বদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মনে হয় এই জৈন গ্রন্থের কথাই ঠিক, কেননা, তান্ত্রিক সাধনসদৃশ ধর্মপদ্ধতি পূর্ব ভারতের প্রাক্-বৈদিক জনগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং উহাই 'ব্রাত্যধর্ম' বা অনুরূপ কোন ধর্ম হবে । (লেখকের "History & Culture of Bengal" গ্রন্থ দেখুন)। পরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ হিন্দুরা যখন উহা গ্রহণ করেছিল, তখন তারা দার্শনিক আবরণে তাকে মণ্ডিত করেছিল । প্রায় ষাট বছর আগে এ সম্বন্ধে বক্রেশ্বরের বিখ্যাত তান্ত্রিক অঘোরীবাবা যা বলেছিলেন তাও এখানে প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছিলেন, "বেদের উৎপত্তির বহু

শতাব্দী পূর্বে তন্ত্রের উৎপত্তি । তন্ত্র মন্ত্রমূলক নয়, ক্রিয়ামূলক । অনার্য বলে আর্যরা যাদের ঘৃণা করতেন, সেই দ্রাবিড়দের ভাষাতেই তন্ত্রের যা কিছু ব্যবহার ছিল । পুঁথিপুস্তক তো ছিল না, বেদের মতই লোকপরম্পরায় মুখে মুখে তার প্রচার ছিল । সাধকদের স্মৃতির মধ্যেই তা বদ্ধ ছিল । তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতির নামগন্ধও ছিল না। কারণ, তন্ত্রের ব্যবহার যে-সব মানুষকে নিয়ে, তার মধ্যে জাত কোথায় ? সাধারণ মানুষের ধর্মকর্ম নিয়েই তো তন্ত্রের সাধন । তন্ত্রের জগতে বা অধিকারে ঘৃণার বস্তু বলে কিছুই ছিল না । শবসাধন, পঞ্চমুণ্ডি আসন, মদ্য-মৎস্যমাংসের ব্যবহার এ সবই তো তন্ত্রের, আর্য ব্রাহ্মণদের ধারণায় ভ্রষ্টাচার । শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণরা যতদিন বাঙলায় আসেন নি, ততদিন তাঁদের এ ভাবের যে একটা ধর্ম সাধনা আছে, আর সেই ধর্মের সাধন প্রকরণ তাদেরই একদল গ্রহণ করে ভবিষ্যতে আর একটি ধর্ম গড়ে তুলবেন, একথা তারা কল্পনায়ও আনতে পারেন নি। তারপর তন্ত্রের ধর্ম গ্রহণ করে ক্রমে ক্রমে তারা অনার্যই হয়ে পড়লেন–তাঁদের বৈদিক ধর্মের গুমোর আর কি রইল ?" (প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, "তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ") । বস্তুত খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধ যখন প্রাচ্যভারতে ধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন লোকায়ত ধর্ম হিসাবে তন্ত্রধর্মেরই এখানে প্রচলন ছিল । এটা আগে উদ্ধত জৈনসূত্র থেকেই আমরা জানতে পারি । নারীসঙ্গমই হচ্ছে তন্ত্রধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ । বুদ্ধ প্রথমে সঙ্ঘের মধ্যে নারীদের প্রবেশের বিরোধী ছিলেন । কিন্তু পরে তিনি তার ধর্মের প্রতি জনপ্রিয়তালাভের জন্য, এটা এড়াতে পারেন নি। বুদ্ধ সঙ্ঘে নারীকেও স্থান দিয়েছিলেন । তখন থেকেই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর সৃষ্টি হয় । বৌদ্ধ সঙ্ঘে নারীর প্রবেশ ঘটেছিল বটে, কিন্তু তান্ত্রিক বা তৎসদৃশ কোন গুহ্য সাধনপদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটে নি। এটা ঘটেছিল অনেক পরে । কি

করে সেটা ঘটেছিল, সেটা জানতে হলে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসটা সংক্ষেপে বলা দরকার । বুদ্ধের ধর্মমত বুদ্ধের জীবনকালে লিপিবদ্ধ হয় নি। এর ফলে তাঁর মৃত্যুর পর তার ধর্মমত নানাভাবে ব্যাখ্যাত হতে থাকে । বিশেষ করে 'নির্বাণ' ও'করুণা'- এই দুটি শব্দের অর্থ নিয়ে । এর ফলে সঙ্ঘের মধ্যে নানা শাখার উদ্ভব হয় । সম্রাট অশোকের পূর্বেই বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে আঠারটি শাখার উদ্ভব ঘটেছিল। পরে এগুলি দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়— হীনযান ও মহাযান । মহাযানীদের মধ্যে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুপ্রবেশ ঘটে । এর ফলে বজ্রযান নামে এক নূতন যানের উদ্ভব ঘটে । বজ্রযানের আবার বিবর্তন হয় কয়েকটি শাখাতে । তার মধ্যে সহজযান ও কালচক্রযান বিশেষ প্রভাবশালী হয় । যদিও হীনযানীদের গ্রন্থসমূহে কিছু কিছু হিন্দুদেবতার, যথা–ইন্দ্র, ব্রহ্মা, কুবের, বসুধারা প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়, তাদের কিন্তু কোন দেবতামণ্ডলী ছিল না । ভগবান বুদ্ধের ন্যায় তারা মূর্তিপূজার বিরোধী ছিল । তবে তারা বুদ্ধের ব্যবহৃত জিনিস এবং প্রতীকের, যেমন পদচিহ্ন, বোধিবৃক্ষ, ধর্মচক্র ইত্যাদি বহুবিধ চিহ্ন পাথরে খোদাই করে, তৎপ্রতি তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত। তারপর বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করা হয়। কোথায় এবং কাদের দ্বারা বুদ্ধের মূতি প্রথম তৈরি হয়েছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে । অনেকে বলেন যে, গ্রীক বৌদ্ধরাই গান্ধার ভাস্কর্যে প্রথম বুদ্ধের মূতি তৈরি করেছিল । আবার অনেকে বলেন, এটা মথুরা ভাস্কর্যেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল । গান্ধার ভাস্কর্যে শুধু বুদ্ধের নয়, জম্ভল, হারতী ও বোধিসত্ত্বদের মূর্তিও তৈরি হয়েছিল । অবশ্য মথুরা ভাস্কর্যেও এ সব মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, এবং তা ছাড়া কুবের, যক্ষ, নাগ প্রভৃতির মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয় । গুপ্তযুগের আগে পর্যন্ত হীনযানের প্রভাবই খুব বেশি ছিল । মহাযানের দু-একটি বোধিসত্ত্ব ছাড়া, আর কোন দেবতার মূর্তি বড় একটা দেখা যায় না।

মহাযান যখন বজ্রযানে বিকশিত হয় তখনই এক বিশাল বৌদ্ধ দেবতামণ্ডলীর উদ্ভব হয় । বজ্রযান ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম। এই ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল পূর্বভারতে বাঙলাদেশে, এবং নিঃসন্দেহে বাঙলার লোকায়ত তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাবে । তারানাথের মতে তন্ত্রের উৎপত্তি বহু পূর্বেই হয়েছিল, কিন্তু উহা সুপ্ত অবস্থায় ছিল, এবং গোপনভাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় লুক্কায়িত ছিল। পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সিদ্ধাচার্যদের সক্রিয় প্রভাবে উহা জনপ্রিয় হয়ে উঠে । বাজ্রযানের চারটি কেন্দ্র বা পীঠস্থান ছিল, উড্ডীয়ান, কামাখ্যা, শ্রীহট্ট ও পূর্ণগিরি। এই চারটি পীঠস্থানেই একটা করে বজ্রযোগিনীর মন্দির ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রযানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবলভাবে চলে । বৌদ্ধরাই তন্ত্রের গূঢ় সাধন-পদ্ধতি লিখিতভাবে প্রথম প্রকাশ করে। তারা যে তন্ত্রগ্রন্থ প্রথম রচনা করে তার নাম হচ্ছে গুহ্যসমাজতন্ত্র । সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অসঙ্গ কর্তৃক এ-খানা রচিত হয়েছিল । বইখানি বরোদার গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে প্রকাশিত হয় । এই সিরিজে বজ্রযান সম্বন্ধে আরও তিনখানা বই প্রকাশিত হয়েছিল, যথা 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ', 'নিষ্পন্নযোগাবলী' ও 'সাধনমালা' ; কিন্তু সবগুলিই এখন দুষ্প্রাপ্য। এছাড়া আরও বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ ছিল। যদিও বলা হয় যে, বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা ৭৪ ; তা হলেও বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে এদের সংখ্যা বহু সহস্র ।

বজ্রযানকে সহজযান বা সহজিয়া ধর্মও বলা হত । এই ধর্মকে 'সহজ' বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, এ সহজ পথে মানুষকে আত্মোপলব্ধির পথে নিয়ে যেত । সহজাত মনুষ্যস্বভাবকে অতিক্রম করবার চেষ্টা না করে, স্বভাবের অনুকূল পথ অবলম্বন করে আত্মোপলব্ধি করাই সহজ পথ । সহজিয়ারা বলেন যে মন্ত্রতন্ত্র, ধ্যানধারণা হচ্ছে বৃথা,

মহাসুখ স্বরূপ সহজের উপলব্ধিই হচ্ছে পরম নির্বাণ । যারা সহজপথে যান, তাঁদের আর জন্মমৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ফিরে আসতে হয় না । এই বৌদ্ধ চিন্তাধারাই আমরা চর্যাপদসমূহের মধ্যে লক্ষ্য করি । সহজপথে নির্বাণ লাভ করা যায়, গুরু উপদেশে ও সহজপথে সাধনার দ্বারা । দেহই হচ্ছে এ সাধনার অবলম্বন। 'দেহভাণ্ডই হচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতি ব্রহ্মাণ্ড । মহাসুখের মধ্যে চিত্তের নিঃশেষ নিমজনই হল পরম নির্বাণ ।

।। পাঁচ ।।

বজ্রযানের দেবতামণ্ডলী ও সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলব। বজ্রযানীদের কল্পনায় আদি-বুদ্ধই হচ্ছেন সৃষ্টির কারণ। তিনি সর্বব্যাপী। সৃষ্টির প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তিনি বিদ্যমান। সেজন্য সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই স্বভাবসিদ্ধ শূন্যরূপ নিঃস্বভাব ও বুদ্ধদস্বরূপ । কেবল শূন্যই নিত্য । আদি-বুদ্ধই হচ্ছেন এই শূন্যের রূপকল্পনা । এই শূন্যই হচ্ছে 'বজ্র' । সেজন্য দেবতা হিসাবে আদি-বুদ্ধকে বজ্রাধর বলা হয়। তাঁর শক্তি প্রজ্ঞাপারমিত । কোন মূর্তিতে তাকে প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে যুগনদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় । তবে একক মৃতিও পাওয়া যায়। একক অবস্থায় তিনি শূন্য, আর যুগনদ্ধ অবস্থায় তিনি বোধিচিত্ত । একটি শূন্যতা অপরটি করুণা বজ্রযানীদের সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে বোধিচিত্ত লাভ করা । বোধিচিত্তে কেবল মহাসুখের অনুভূতি ছাড়া আর কোন অনুভূতি থাকে না । এই মহাসুখের মধ্যে চিত্তের নিমজ্জনই হচ্ছে পরম নির্বাণ । দেহই হচ্ছে। এ সাধনার অবলম্বন । বোধিচিত্তের উৎপাদনে মণিমূলই আনন্দের উৎপত্তিস্থল। সে আনন্দ সর্বপ্রকার প্রকৃতিদোষমুক্ত ! সে আনন্দের উর্ধায়নই হচ্ছে বোধিচিত্ত বা পরমার্থ লাভ । তখন

সাধকের দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে । এ সাধনায় পাঁচটি পর্যায় আছে : প্রথম মরীচিকা দর্শন, দ্বিতীয় ধূম দর্শন, তৃতীয় আলোক-বিন্দুর দর্শন, চতুর্থ দীপালোক দর্শন ও পঞ্চম পর্যায়ে সতত আলোক দর্শন, তবে সে আলোক হচ্ছে মেঘশূন্য আকাশের ন্যায় । তখনই দেবতা দর্শন হয়, তবে সেটা আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপার ।

বৌদ্ধ দেবতামণ্ডলীতে অসংখ্য দেবতা আছেন । নানাপ্রকার বোধিচিত্ত থেকেই এ সব দেবতার উৎপত্তি । বৌদ্ধ দেবতাদের মধ্যে আছেন আদি-বুদ্ধ' পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ ও তাঁদের শক্তি, যথা অক্ষোভ্য (শক্তি মামকী), অমিতাভ (শক্তি পাণ্ডরা), অমোঘসিদ্ধি (শক্তি তারা), বৈরোচন (শক্তি লোচনা), রত্নসম্ভব (শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরী) ও বজ্রসত্বা (শক্তি বজ্রসত্বাত্মিকা) । এদের হয় শক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত ও যুগনদ্ধ অবস্থায় আর তা নয়তো তাদের মূতির বাম পার্শ্বে শক্তির প্রতীকরূপ একটি ত্রিকোণাকৃতি যন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। তার পরের পর্যায়ের দেবতাগণ হচ্ছেন সাতটি মানুষী বুদ্ধ ও তাঁদের শক্তি, বোধিসত্ত্বগণ ও তাদের শক্তিদেবীসমূহ অমিতাভকুলে দেবদেবীসমূহ অক্ষোভ্য কুলের দেবদেবীগণ, বৈরোচনকুলের দেবদেবীগণ, রত্নসম্ভবকূলের দেবদেবীগণ, অমোঘকুলের দেবদেবীগণ, দশদিগদেবতা, ছয় দিগদেবী, আটটি উষ্ণীষ দেবতা, পঞ্চরক্ষাদেবী, চার লাস্যাদি দেবী, চার দ্বারদেবী, চার রশ্মিদেবী, চার পশুমুখী দেবী, চার ডাকিনী, দ্বাদশ পারমিতা, দ্বাদশ বশিতা, দ্বাদশ ভূমি দেবী, দ্বাদশধারিণী ইত্যাদি । (যাঁরা বৌদ্ধ দেবদেবী সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানতে চান তাঁরা বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বই পড়ে নিতে পারেন)।

।। ছয় ।।

বৌদ্ধর যখন তন্ত্রের গুহ্যসাধনপদ্ধতি প্রকাশ করে দিলেন, তখন হিন্দুরা আর চুপ করে বসে রইল না । তারাও এই লোকায়ত গুহ্যসাধনা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হল । তারা প্রথমে যে ধর্ম প্রচার করল, সেটা হচ্ছে নাথধর্ম । সমস্ত তান্ত্রিক সাধনাই হচ্ছে গুরুত্ববাদী ধর্ম । যেহেতু তারা যোগমার্গে সিদ্ধ ছিল, সেজন্য নাথধর্মাবলম্বীদের যোগী বলা হত । নাথপন্থ বা নাথধর্ম শৈবধর্মেরই একটা শাখা বিশেষ । এর ওপর বৌদ্ধ ও তন্ত্রধর্মের প্রভাব ছিল । কথিত আছে, শিব যখন দুর্গাকে গুহ্যতত্ত্বের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন নাথধর্মাবলম্বীদের আদিপুরুষ মীননাথ গোপনে তা শুনেছিলেন । শিবই নাথদের আরাধ্য দেবতা এবং 'কায়া'-সাধনই নাথদের চরম লক্ষ্য । নাথধর্ম প্রধানতঃ বাঙলার নিম্নকোটির লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল । তবে এই ধর্মকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তা থেকে আমরা মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ, গোরক্ষনাথের শিষ্য রানী ময়নামতী, রানী ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র ও তঁদের নানারূপ অলৌকিক শক্তির কথা জানতে পারি। ধর্মটি এক সময় সুদূর পেশওয়ার থেকে ওড়িশা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল ।

নাথধর্মকে অবলম্বন করে যেমন একটা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, হিন্দু-তন্ত্রধর্মকে অবলম্বন করেও এক বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছিল । তার আগে তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির গোপন ব্যাখ্যা হত । বলা হত।– "কূলবর্ত্ম গোপনীয়ম্" । আগমতন্ত্রবিলাস অনুযায়ী হিন্দুতন্ত্রের সংখ্যা হচ্ছে ১৪৭ । এ ছাড়া বরাহতন্ত্রে আরও ৫৪ খানি হিন্দুতন্ত্রের নাম আছে।

হিন্দুতন্ত্রগুলি অধিকাংশই মধ্যযুগে রচিত হয়েছিল। সপ্তদশঅষ্টাদশ শতাব্দীর একখানা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় তন্ত্র হচ্ছে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রচিত 'তন্ত্রসার' ।

তন্ত্রগ্রন্থসমূহ সব একই পন্থাবলম্বী নয়। বলা যেতে পারে যে, যত গ্রন্থ তত পন্থ । মোট কথা, সব তন্ত্রের উপাস্য দেবতা ও উপাসনাপদ্ধতি এক নয়। কারুর উপাস্য দেবতা শিব, কারুর শক্তি, কারুর বিষ্ণু, কারুর সূর্য, আবার কারুর গণপতি । এই উপাস্য দেবতার বিভেদ অনুযায়ী উপাসকদের শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য নামে অভিহিত করা হয়। তবে এদের মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবরাই সংখ্যায় অধিক । এই সব মূল সম্প্রদায় ছাড়া. আবার বহু উপসম্প্রদায় আছে । নানা শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হওয়ার দরুন, তন্ত্র সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা করা খুব কঠিন । বস্তুত তন্ত্রের জগৎ অতি জটিল জগৎ । তবে তন্ত্রের উপাসনা পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই সব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে-মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, মুদ্রা, আসন, ন্যাস, দেবতার প্রতীক স্বরূপ বর্ণরেখাত্মক যন্ত্র, সাধনার সময় মৎস, মাংস্য, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চ-মকারের ব্যবহার, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি যট্‌কর্মের আশ্রয় গ্রহণ ও যোগানুষ্ঠান। তবে সব সম্প্রদায়ের উপাসনার মধ্যেই যে এ সব বৈশিষ্ট্য আছে তা নয়। যথা, যারা বামাচারী তান্ত্রিক সাধক তারাই মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চ-মকারের আশ্রয় গ্রহণ করে । নারীসঙ্গমই এই উপাসনার ভিত্তি । এই সাধনায় নারীসঙ্গমের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁরা যে ব্যাখ্যা করেন, তার সমস্তটাই হচ্ছে রহস্যময়, গূঢ় ও গুহ্য । তন্ত্রমতে নারীর দুই স্বরূপ-কামিনী ও জননী-একই । যাদের পক্ষে নৈতিক হিসাবের স্ত্রী ও জননী পৃথক সংস্কার, তাদের পক্ষে এ ধারণা করা খুবই

কঠিন। একজন ভৈরবের ভাষায় বলি-মাতৃভাবই বল, আর কামিনী ভাবেই বল, দুই তো আরোপিত ভাব, আসলে তো সে একই কামিনীর দুটি রূপ বা ভাব । গোড়াতেই তো প্রকৃতি কামিনী, সৃষ্টিতে সম্ভোগার্থেই তো তার সার্থকতা । তারপর যখন সৃষ্টি হয়ে গেল, সেই সৃষ্টজীবের অসহায় ও দুর্বল অবস্থায় তার লালন পালন ও বৃদ্ধির জন্যই তো জননী ভাবটি । নারীমাত্রেই পরমাপ্রকৃতি আদ্যশক্তির অংশ । মানুষ সমাজের একটা নৈতিক সংস্কারকে সনাতন সত্য বলে মেনে নিলে তত্ত্বের দিক থেকে সত্য উদ্ধার অসম্ভব হবে । প্রকৃতির আসল ভাব অতি গুহ্য, অনির্বচনীয় । কেবলানন্দময়ী ভাব । তার বর্ণনা নেই। এই জন্যই পরমহংসদেব এক সময় মা ঠাকরুণকে 'আমি' তোমার কে ?'–এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন–'তুমি আমার আনন্দময়ী গো ।'

তান্ত্রিক সাধনায় তিনটি অধিকারভেদ আছে। উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারভেদে দিব্যাচার, বীরাচার ও পশ্বাচার। ভোগ না হলে, ত্যাগ আসে না, সেজন্যই তান্ত্রিক সাধনার প্রথম ধাপ পশ্বাচার। এই ধাপে সাধক কামকে সম্পূর্ণভাবে জয় করেন। পশ্বাচারের পর সাধক বীরাচারে প্রবৃত্ত হয় । এই সাধনায় ভয়ের ভাব মন থেকে দূর হয়ে যায়। অমাবস্যার নিশায় শবের ওপরে বসে সাধনায় প্রবৃত্ত হয় । পাশমুক্ত হওয়াই এই সাধনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। যখন সকল পাশগুলিকে সাধক মন থেকে সমূলে উৎপাটিত করে, তখন সে দিব্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। তখনই সে প্রকৃত শক্তির অধিকারী হয় । তান্ত্রিক সাধনায় মৈথুন কামমার্গ নয়। মৈথুন সম্বন্ধে শিবের মুখ দিয়ে তন্ত্রে বলা হয়েছে :

'মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম ।

মৈথুনাজায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ।।
রেফন্তু কুণ্ডমাভাস: কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ।
মকারাশ্চ বিন্দুরূপে মহাযোগৌ স্থিতঃ প্রিয়ে ।।
আকারহংসমারুহ্য একতা চ যদঃ ভবেৎ ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদর্লভম ।।

বস্তুতঃ তন্ত্রগ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে যে ‘মৈথুন’ ছাড়া কুলপূজা হয় না । যেমন গুপ্তসংহিতায় বলা হয়েছে-“কুলশক্তিম বিনা দেবী যো জপেত স তু পামর ।” আবার বলা হয়েছে যে, সে নারী নিজের স্ত্রী হলে চলবে না । এ সম্বন্ধে নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে ‘বিবাহিতা পতিত্যাগে দুষণমন কুলার্চনে।’ তার মানে কুলপূজার জন্য সধবা স্ত্রীলোক যদি তার পতিত্যাগ করে, তবে তার কোন দোষ হয় না । মাত্র সধবা হলেই চলবে না । সে ষোড়শী, সুন্দরী, কামবর্জিতা ও বিপরীতরমণদক্ষ হওয়া চাই । (‘বিপরীতরতা সা তু ভাবিত হৃদয়োপরি’) । এরূপ কুলপূজায়রত নারীকে কুলনায়িকা বলা হয়। কুমারীতন্ত্রে বলা হয়েছে যে নটী, কাপালিকা, বেশ্য, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, মালাকার কন্যা, নাপিত স্ত্রী, রাজকী ও গোপালকন্যা, এই নববিধ কন্যাই এই কার্যে প্রশস্ত । বিকলাঙ্গী, বিকৃতাঙ্গা, সন্দিগ্ধচিত্তা, বৃদ্ধা, পাপযুক্ত, হুঙ্কারকারিণী, অর্থলুব্ধ, অভক্তিচিত্তা এবং কাতরা রমণীকে এই কার্যে ত্যাগ করবে। কুলচুড়ামণিতন্ত্রে বলা হয়েছে বিশেষভাবে লীলাচাতুর্য থাকলে যাবতীয় কুলাঙ্গনাই শক্তিরূপে গৃহীত হতে পারে। (বিশেষবৈদদ্ধ যুতঃ সর্ব্ব এব কুলাঙ্গনা) । কুলচূড়ামণিতন্ত্রে আরও বলা হয়েছে যে, অন্য রমণী যদি না আসে তা হলে নিজের কন্যা, নিজের কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতুলানী, মাতা বা বিমাতাকে নিয়ে

কুলপূজা করবে । (অন্যা যদি ন গচ্ছেত্তু, নিজকন্যা নিজানুজা । অগ্রজা মাতুলানী বা মাত। বা তৎ সপত্নিকা । পূর্বাভাবে পরা পূজ্যা মদংশা যোযিতো মতাঃ। এক চেৎ কুলশাস্ত্রজ্ঞ পূজার্হা তত্র ভৈরব ।।'

কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করাই তান্ত্রিক সাধনার উদ্দেশ্য। এই শক্তি মূলাধারস্থ পদ্মমৃণালে (যোনিমূলে) কুণ্ডলাকারে সর্পবৎ সুপ্ত অবস্থায় নিহিত থাকে । জাগ্রত করলে ইহা দেহস্থ সূক্ষ্মতন্তুবৎ ও সুষুম্না নাড়ীর (মেরুদণ্ড) মধ্য দিয়ে ছয়টি পদ্ম বা চক্রের পথে প্রবাহিত হয়, ও একে জাগরিত করে । ('আদৌ পুরকযোগেন স্বাধারে যোজয়েন্মনঃ। গূদমেঢ্রান্তরে শক্তিং তামাকুঞ্চ্য প্রবোধয়েৎ' ।।) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে — "ইহজন্মে এবং পূর্বপুর্ব জন্মান্তরে যত মানসিক পরিবর্তন বা ভাবজীবের উপস্থিত হইতেছে ও হইয়াছিল তৎসমূহের সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিকৃতি অবলম্বনে অবস্থিত মহা ওজস্বিনা প্রেরণাশক্তিকেই পতঞ্জলি প্রমুখ ঋষিগণ ঐ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । যোগী বলেন উহা বদ্ধ জীবে প্রায় সম্পূর্ণ সুপ্ত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে । উহার ঐরূপ সুপ্তাবস্থাতেই জীবের স্মৃতি কল্পনা ইত্যাদি বৃত্তির উদয় । উহা যদি কোনরূপে সম্পূর্ণ জাগরিত বা প্রকাশ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় তবেই জীবকে পূর্ণজ্ঞান লাভে প্রেরণ করিয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ করাইয়া দেয় ।"

রাত্রিকালে সাধক 'আমি শিব' (ধ্যাত্বা শিবোহমতি') এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নগ্ন অবস্থায় নগ্ন রমণী রমণ করত ("ততে নগ্নাং স্ত্রিয়ং নগ্নং রমণ ক্লেদযুতোহপি বা") রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নিজ সাধন কার্যে লিপ্ত থাকবে । কুলার্ণবতন্ত্র অনুযায়ী এই

সাধন-প্রক্রিয়া কি, তা আমি আর বাংলায় অনুবাদ করব না । মূল সংস্কৃত শ্লোকই এখানে উদ্ধৃত করছি—

“আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনয়োর্মর্দনস্তথা ।
দর্শনং স্পর্শণং যোনের্বিকাশে লিঙ্গঘর্ষনম্ ।।
প্রবেশ স্থাপনং শক্তের্ণব পুষ্পানিপূজনে” ।

সাধারণ পাঠককে তন্ত্রের গুহ্য রহস্যময় জগতে আর নিয়ে যেতে চাই না । সেজন্য এ সম্বন্ধে এখানেই থেমে যাচ্ছি ।

।| সাত ।।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতামণ্ডলীর ন্যায়, হিন্দু তান্ত্রিক দেবতামণ্ডলীতেও অসংখ্য দেবদেবী আছেন । তবে তাঁদের মধ্যে দশমহাবিদ্যাই হচ্ছেন প্রধান । এই দশমহাবিদ্যা হচ্ছেন- “কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী । ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা । বগল সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা । এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।” এই সকল দেবতার ধ্যানমন্ত্র থেকে আমরা তাদের আকৃতির পরিচয় পাই। কালী উলঙ্গিনী, সহস্যবদনা, চতুর্ভূজা, কৃষ্ণবর্ণা, দিব্যরূপিণী, গলদেশে নরমুণ্ডমালা, বামভাগের নীচের হাতে অভয়মুদ্রা ও ওপর হাতে বরমুদ্রা । তিনি শিবরূপ শবের ওপর দণ্ডায়মান । তারা ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা খর্ব, লম্বোদরী, ভয়ঙ্করাকৃতি, গলদেশে নরমুণ্ডরচিত মালা,

চতুর্ভূজা ও নবযুবতীরূপা । শবহৃদয়ে তাঁর বাম পদ বিন্যস্ত। ষোড়শী 'বালাকমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুংত্রিলোচনাম্। পাশাংকুশ শরাংশ্চাপান্ ধারয়ন্তীং শিবং ভজে"। ভুবনেশ্বরীর উদিত সূর্যের ন্যায় দেহকান্তি, কপালে অর্ধচন্দ্র, মস্তকে মুকুট, পীনোন্নত পয়োধরা, ত্রিনয়না, চতুর্ভূজা ও সহাস্যবদন । ভৈরবীর উদয়কালীন সূর্যের ন্যায়। দেহকান্তি, কপালে অর্ধচন্দ্র, রক্তবর্ণা, ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিতা, গলায় মুণ্ডমালা, রক্ত অনুলিপ্তস্তনা, মাথায় মুকুট ও চতুর্ভূজা। তাঁর হাতে যথাক্রমে জপমালা, পুস্তক, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা আছে। ছিন্নমস্তার সদা ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীর ন্যায় আকৃতি, স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত, আলুলায়িত কেশ, বিবসনা ও ভয়ঙ্করী। তিনি বাম করে আপনি ছিন্নমস্তক ধারণ করেন ও নিজকণ্ঠোত্থিত রক্ত পানে রত। ধূমাবতী 'বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা । বিবর্ণকুন্তলা রক্ষা বিধবা বিরলাদ্বিজা ।" ইনি কাকধ্বজ রথে আরোহণ করে থাকেন । বগলা সুধাসাগর মধ্যে মণিময়মণ্ডপো রত্ননির্মিত বেদীর ওপর সিংহাসনে উপবিষ্টা, পীতবর্ণা, মাল্য বিভূষিতা দ্বিভূজা ও পীতবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা । মাতঙ্গী শ্যামবর্ণা, অর্ধচন্দ্রদ্ধারিণী ও ত্রিনয়না। ইনিও রত্ননির্মিত সিংহাসনে উপবিষ্টা । কমলার দেহকান্তি কাঞ্চনের ন্যায়। তিনি চতুর্ভূজা, তাঁর মস্তক রত্নমুকুটে বিভূষিতা । তাঁর করে পঞ্চবস্তু ও তিনি পদ্মের ওপর উপবিষ্টা ।

তান্ত্রিক সাধকরা তাদের সাধনা করেন বীজমন্ত্র ও যন্ত্রের সাহায্যে । কয়েকটি যন্ত্রের নাম যথা, নবদুর্গা যন্ত্র, ত্রিপুরা যন্ত্র, বিন্ধ্যবাসিনী যন্ত্র, কালী যন্ত্রম্, শিব যন্ত্রম্ ইত্যাদি। এ সকল যন্ত্রের অর্থ যেমন গূঢ়, বীজমন্ত্রসমূহও তাই । যেমন কালীর বীজমন্ত্র হচ্ছে–"ক্রাং ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা ।" তারার বীজমন্ত্র—"ওঁ হ্রং স্ত্রীং হুং ফট।" এ সকল বীজমন্ত্রের ভাষা সহজে বোধগম্য নয়। ভাষা বোধ হয় আদিম কালের হবে ।

।। আট ।।

তন্ত্রের ধর্ম যে মাত্র বৌদ্ধদের প্রভাবান্বিত করেছিল তা নয় । সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মকেও প্রভাবান্বিত করে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিল । শ্রীচৈতন্য প্রেমের ধর্ম প্রচার করেছিলেন । সে ধর্ম স্বমহিমার ধর্ম । তিনি নিজের মধ্যেই কৃষ্ণ ও রাধা- এই উভয়ের সত্তা অনুভব করেছিলেন । 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবাপু তাঁহার স্বরূপ।' কিন্তু চৈতন্যোত্তরকালে বৈষ্ণবরা প্রেমের সঙ্গে কামের সমীকরণ করে ফেলেন। তাঁরা নররূপ স্বরূপকে কৃষ্ণ ও নারীরূপ স্বরূপকে রাধা বলে উঠলেন । রূপের মিলনে যখন স্বরূপের মিলন সংঘটিত হবে, তখনই আসবে অনাবিল সাম্যরসের অনুভূতি । এর ফলে সমাজে ব্যভিচারের প্লাবন ঘটে। ব্যভিচারের স্রোত তো আগে থেকেই এসেছিল যখন কপট হিন্দু তান্ত্রিকরা সাধক সেজে তন্ত্রবচনের দোহাই দিয়ে নারীকে প্রলুব্ধ করত সাধিকা হতে । এই ব্যভিচারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে দক্ষিণাচারীরা । এরা তন্ত্রের অপর এক সাধক-সম্প্রদায় । এরা বামাচারীদের মত পঞ্চমকারের সাহায্যে সাধনা করেন না । এরা নিজের স্বরূপে মধ্যেই শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করেন। শিবগমে বলা হয়েছে—'শক্তি শিবঃ শিব শক্তিঃ শক্তি ব্রহ্মা জনার্দন । শক্তিরিদ্রো রবিঃ শক্তিং শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবম্। শক্তিজপং জগৎ সর্বম্ যে ন জানাতি নারকী ।" তার মানে–'শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা শক্তি, জনার্দন শক্তি, ইন্দ্র শক্তি, সূর্য শক্তি, চন্দ্র শক্তি, গ্রহগণ শক্তি স্বরূপ, অধিক কি, এই নিখিল জগৎকেই যে শক্তিরূপে বুঝিতে পারে না, সে নরকগামী ।'

তন্ত্রধর্ম ও আমাদের সমাজজীবন, সাহিত্যসাধনা, স্বদেশপ্রেম পঞ্চমকার প্রভৃতির ওপর যে ধর্মের প্রভাব সে সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আছে, কিন্তু তা এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে বলা সম্ভবপর নয় । সেজন্য এখানেই আমি ক্ষান্ত হচ্ছি ।

বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীদের আচরণ

এদেশের লোক অতি প্রাচীন কাল হতেই বিদ্যাধরীতে বিশ্বাস করে এসেছে। বিদ্যাধরী কারা ? অভিধান খুলে দেখি, বিদ্যাধরীরা দেবযোনি বিশেষ। তবে অন্য সূত্র থেকে জানতে পারা যায়, এরা পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থলে বাস করে। সাধারণতঃ এরা মঙ্গলকামী অনুচর হলেও এদের নিজেদের রাজা ছিল । এরা মনুষ্য জাতির সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করত । এদের কামরূপী বলা হত, কারণ এরা ইচ্ছা মত নিজের চেহারা পরিবর্তন করতে সক্ষম হত । ভারতীয় ভাস্কর্যে উড়ন্ত বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীদের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

যাঁরা বঙ্কিমের 'ইন্দিরা' পড়েছেন, তঁরা জানেন যে ইন্দিরা উপেন্দ্রের কাছে আত্মপ্রকাশ না করে বলেছিল– 'আমি মায়াবিনী । কামরূপে আমার অধিষ্ঠান । আমি আদ্যাশক্তির মহামন্দিরে তাহার পার্শ্বে থাকি । লোকে আমাদিগকে ডাকিনী বলে কিন্তু আমরা বিদ্যাধরী। আমি মহামায়ার নিকট কোন অপরাধ করেছিলাম, সেই জন্য অভিশাপগ্রস্ত হইয়া এই মানবীরূপ ধারণ করিয়াছি। পাচিকাবৃত্তি ও কুলটা বৃত্তি ভগবতীর শাপের ভিতর । তাই এই সকল অদৃষ্ট ঘটিয়াছে।' যদি তৎকালীন পাঠকসমাজ বিদ্যাধরীদের আজগুবী বা ঐ জাতীয় কিছু বলে মনে করত তা হলে বিদ্যাধরীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বঙ্কিম কখনই তার উপন্যাসখানিকে অবাস্তবতার রূপ দিতেন না ।

বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীদের সম্বন্ধে বহু কাহিনী নিবন্ধ আছে কাশ্মীরী কবি সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'-এ । 'কথাসরিৎসাগর'-এর রচনাকাল আনুমানিক ১০৬৩-৮১ খ্রীষ্টাব্দে । সোমদেব তার গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থরচনার যে ইতিহাস দিয়েছেন, তা থেকে জানতে পারা যায় যে জলন্ধর-রাজকন্যা কাশ্মীররাজ অনন্তের মহিষী সূর্যমতীর চিত্তবিনোদনের জন্য গুণাঢ্য রচিত পৈশাচী ভাষায় লিখিত 'বৃহৎকথা" অবলম্বনে সোমদেব তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 'কথাসরিৎসাগর'-এর প্রথম তরঙ্গ থেকে জানতে পারা যায় যে, সিদ্ধ বিদ্যাধর ও প্রমথগণ কৈলাসচলে মহাদেব ও পার্বতীর অনুচর হয়ে তাঁদের সেবা করে থাকেন ।

'কথাসরিৎসাগর'-এর ষষ্ঠ লম্বকে চতুস্ত্রিংশৎ তরঙ্গে মদনমঙুকার উপাখ্যানে আমরা দেখি কিভাবে বিদ্যাধর-রাজ বৎস রাজার রূপ ধারণ করে বৎসরাজার প্রণয়িণী কলিঙ্গসেনার পানিগ্রহণ করেছিল । সেখানে আমরা বঙ্কিমের প্রতিধ্বনিও দেখি –'পূর্বে তুমি অপ্সরা ছিলে, এখন দেবরাজ ইন্দ্রের অভিশাপে মানুষী যোনি প্রাপ্ত হইয়াছ । তুমি সতী হইয়াও কর্মফলে অসতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছ ।'

'কথাসরিৎসাগর'-এর রত্ন প্রভা নামক সপ্তম লম্বকের চতুশ্চত্বারিংশ তরঙ্গে কোন বিদ্যাধর অন্তরীক্ষ হতে ভূতলে নেমে বৎসরাজকে বলে–'রাজন ! হিমালয়ের অন্তবর্তী বজ্রকুট নগরে আমার বাস এবং আমার নাম বজ্রপ্রভ । ভগবান ভবানীপতি আমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আমাকে শত্রুর অজেয় করিয়াছেন । আজ আমি ভগবানকে প্রণাম করিয়া আসিতে আসিতে নিজ বিদ্যা প্রভাবে জানিতে পারি রাজকুমার নরবাহনদত্ত দেব

উমাপতির একজন পরম ভক্ত, এবং কামদেব অংশম্ভূত, সেই ভগবানের কৃপায় তিনি স্বর্গ-মর্ত্য উভয়লোকে রাজত্ব করিবেন। পুরাকালে রাজা সূর্যপ্রভ মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া বিদ্যাধর সিংহাসনের দক্ষিনার্ধ শ্রুতশর্মা নামক রাজা উত্তরাধিকান্ন সূত্রে প্রাপ্ত হন ।'

শ্রুতশর্মা ও সূর্যপ্রভের উল্লেখ আমরা পাই পঞ্চচত্বারিংশ তরঙ্গে । সেখানে আছে– 'অনন্তর একদিন দেবর্ষি নারদ রাজসভায় আসেন ও রাজদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, রাজন ! দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে এই বলিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনার যে মহাদেবের আদেশে ময়দানবের সাহায্যে মর্ত্যবাসী সূর্যপ্রভকে বিদ্যাধর পদে প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন তাহা আতিশয় অযোগ্য। যেহেতু আমরা শ্রুতিশর্মাকে এই পদ প্রদান করিয়াছি, সেই পদ।। তাহার কুলক্রমাগত ভোগে থাকিবে, এইরূপ নির্ধারিত আছে। তবে যদি আপনারা আমাদিগের প্রতিকুল কার্য করিতে চেষ্টা করেন, তাহা কেবল আপনাদিগের আত্মবিশ্বাস হেতু জানিবেন। আপনাকে রুদ্রযজ্ঞ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাহার পরিবর্তে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে আদেশ করা হয়, আপনি তাহাও করেন নি এই প্রকার সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র মহাদেবের আরাধনা করিলে কখনই আপনাদিগের মঙ্গল হইবে না ।'

বিদ্যাধর রাজ্যের অধিপতির পদ নিয়ে শ্রুতবর্ম ও সূর্যপ্রভের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আমরা "কথাসরিৎসাগর'-এর অষ্টম লম্বকের 'সংগ্রাম সমাপন" নামক অষ্টচত্বারিংশ তরঙ্গেও পাই ।

এসব থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে বিদ্যাধর চক্রবর্তীর পদ নিয়ে এক সময় আর্য ও অনার্য সমাজের মধ্যে সংঘাত হয়েছিল । কেননা, মহাদেব ছিলেন.অনার্য দেবতা । আর দেবরাজ ইন্দ্র হচ্ছেন আর্যদের দেবতা এবং অশ্বমেধও আর্যীয় অনুষ্ঠান। 'কথাসরিৎসাগর'-এ যে সব কাহিনী আছে, তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে বিদ্যাধরীরা অনার্য চিন্তার অবদান, এবং তারা অনার্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়াদিতে দক্ষ ছিল।

মহাদেবের অনুচর

মহাদেবের আরও অনুচর ছিল । যথা কুবের, নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল, গণদেবতাগণ, বেতাল, যোগিনী, ভৈরবী, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি। যক্ষ ও রাক্ষসদের জন্ম সম্বন্ধে রামায়ণে আছে –ব্রহ্মা প্রথম জল সৃষ্টি করেন । তারপর সেই জল রক্ষার জন্য প্রাণী সৃষ্টি করেন। প্রাণীদের মধ্যে যারা বলে যক্ষামঃ অর্থাৎ আমরা পূজা করব, তারাই যক্ষ হলেন । আর যারা বলল রক্ষামঃ অর্থাৎ আমরা জল রক্ষা করব, তার হল রাক্ষস । যক্ষদের রাজা কুবের । কৈলাসের অলকাপুরীতে তার বাসস্থান । কুবের মহাদেবের ধনরক্ষক । তিনি মানুষকে ধনপ্রদান করেন ।

ভৃঙ্গী ও মহাকাল দুজনেই শিবের অনুচর। শিব যখন একবার পার্বতীর সঙ্গে বিহার করছিলেন, ভৃঙ্গী ও মহাকাল দ্বাররক্ষক রূপে নিযুক্ত ছিল। গোপনে তারা শিব ও শিবানীর বিহার দেখে। এতে শিবানী ক্রুদ্ধ হয়ে এদের মনুষ্যযোনিতে জন্ম হবে বলে অভিশাপ দেন । তখন ভৃঙ্গী ও মহাকাল শিবানীর কাছে প্রার্থনা করে যে শিব ও শিবানীও যেন মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন, কেননা তারা শিবানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে চায় । শিব দক্ষের পৌত্র পৌষ্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তখন তাঁর নাম হল চন্দ্রশেখর। ওদিকে শিবানী ইক্ষাকুবংশীয় রাজা কুকুৎস্থের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন । তখন, তার নাম হল তারাবতী । চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তারাবতীর বিবাহ হয় । তঁদের দুটি বানর পুত্র জন্মগ্রহণ করে । তারাই হচ্ছে বেতাল ও ভৈরব। এটা কালিকাপুরাণের কাহিনী । বামনপুরাণের অপর এক কাহিনী অনুযায়ী অন্ধকাসুরের সঙ্গে মহাদেবের যখন

যুদ্ধ হয়, অন্ধক তখন মহাদেবের মাথায় পদাঘাত করে । তাতে মহাদেবের মাথা চারভাগে বিভক্ত হয়ে রক্তধারা নির্গত হতে থাকে । এই রক্তধারা থেকে ভৈরবের জন্ম হয়। এ ভৈরবের নাম লম্বিতরাজ। তবে এছাড়া আরও ভৈরব ছিল যথা নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল ও বেতাল ।

গণদেবতারাও শিবের অনুচর। এদের অধিপতি গণেশ । গণেশের নিবাস কৈলাস। গণদেবতারাও কৈলাসে বাস করেন ।

যোগিনীরা শিবানীর সহচরী। তারা বিভিন্ন সময়ে শিবানীকে সাহায্য করে ও তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ করে । যোগিনীরা সংখ্যায় চৌষট্টি জন । তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ভৈরবী । তিনি দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ।

দেবদেবীর কুলজী

বৈদিক দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্রই শ্রেষ্ঠ । তঁর উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদে যত সূক্ত আছে। অন্য কোন দেবতার উদ্দেশ্যে তত নেই। পুরুষসূক্তে (১০।৯০।১৩) ইন্দ্র ও অগ্নি পুরুষের মুখ থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে। অন্যত্র অদিতি তাঁর মা বলা হয়েছে। তিনি মাতৃগর্ভ থেকে মাতার পার্শ্বভেদ করে জন্মাবার চেষ্টা করেন । তিনি জন্মাবধিই যোদ্ধা এবং অসুরবধের জন্য সৃষ্ট হয়েছিলেন । প্রধান প্রধান অসুর যথা বৃত্র, নমুচি, বল, জম্ভ, অহি, চুমুরি, ধুনি, পিপিন, শুষ্ণ প্রভৃতি তাঁর হাতেই নিহত হয়েছিল। তিনি অসুরগণের নগরসমূহ ধ্বংস করেছিলেন বলে, পুরন্দর আখ্যা পেয়েছিলেন।

ইন্দ্রের স্ত্রী শচী বা ইন্দ্রানী । তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ অনুযায়ী ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর যৌনআবেদনে আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য সুন্দরীদের প্রত্যাখান করে ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করেছিলেন । অন্যান্য গ্রন্থে আছে যে তিনি ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নষ্ট করে তাকে বিবাহ করেছিলেন । পুলোবা তার শ্বশুর। ইন্দ্রের পুত্রের নাম জয়ন্ত ।

মহাভারতে আছে গৌতম মুনির অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র তাঁর রূপ ধরে তাঁর স্ত্রী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন। মহাভারতে আরও আছে যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে । ইন্দ্রের রেতঃ থেকে বালীরও জন্ম হয়েছিল ।

অগ্নিও ঋগ্বেদের এক প্রধান দেবতা । ঋগ্বেদে অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত আছে, ইন্দ্র ভিন্ন আর কোন দেবতার তত নেই। অগ্নি দ্যাবা পৃথিবীর পুত্র । আবার বলা হয়েছে। অরণিদ্বয় অগ্নির জনক-জননী । জাতমাত্রই অগ্নি জনক-জননীকে ভক্ষণ করেছিলেন । আবার মহাভারতে আছে যে ধর্মের ঔরসে বসুভার্যার গর্ভে অগ্নির জন্ম। তিনি দক্ষের মেয়ে স্বাহাকে বিবাহ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী অগ্নির তিন পুত্র–পাবক, পবমান ও শুচি।

অগ্নি সর্বভূক। মহাভারতে আছে। অগ্নি শ্বেতকী রাজার যজ্ঞে অতিরিক্ত হবি ভক্ষণ করে দুঃসাধ্য অগ্নিমান্দ্য রোগে আক্রান্ত হন । ব্রহ্মা উপদেশ দেন অগ্নি যদি সমস্ত জীবজন্তু সমেত খাণ্ডকবন দাহন করতে পারে, তা হলে রোগ থেকে মুক্তি পাবে । কিন্তু খাণ্ডববন দেবরক্ষিত বলে ইন্দ্র ওতে বাধা নি । কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্যে অগ্নি খাণ্ডবদাহন করে রোগমুক্ত হন।

সূর্যও আর্যদের একজন উপাস্য দেবতা । নানা নামে যথা সুর্য, সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান, বিষ্ণু ইত্যাদি নামে সূর্যের স্তুতি দেখতে পাওয়া যায় । যাস্ক বলেন–আকাশ হতে যখন অন্ধকার যায় ও কিরণ বিস্তৃত হয়, সেই সবিতার কাল। সায়ন বলেন, উদাোয়র পূর্বে সূর্যের যে মূর্তি তাহাই সবিতা, উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি তাহা সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহন, মধ্য আকাশে স্থিতি, এবং অস্তাচলে অস্তগমন, এই তিনটি বিষ্ণুর পদ-বিক্ষেপ ।

সূর্য পুরুষের চক্ষু হতে উৎপন্ন। সূর্যের মাতা অদিতি । উষাকেও সূর্যের জনয়িত্রী বলা হয়েছে । আবার বলা হয়েছে সূর্য প্রণয়ীর ন্যায় ঊষার অনুগমন করেন । রামায়ণ ও মহাভারত অনুযায়ী সূর্য কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সহিত সূর্যের বিবাহ হয় । সংজ্ঞার গর্ভে সূর্যের বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনা নামে তিন সন্তান হয় । সংজ্ঞা সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে, নিজের অনুরূপ ছায়াকে সৃষ্টি করে সূর্যের কাছে রেখে অশ্বীর রূপ ধারণ করে উত্তর কুরুতে পালিয়ে যায়। ছায়ার গর্ভে সূর্যের সাবর্ণি মনু ও শনি নামে দুই পুত্র ও তপতী নামে এক কন্যা হয়। পরে সূর্য যখন সংজ্ঞার শঠতা বুঝতে পারে তখন অশ্বরূপ ধারণ করে উত্তর কুরুতে গিয়ে সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয় । এর ফলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। মহাভারত অনুযায়ী সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয় । ঋক্ষরজার গ্রীবায় পতিত সূর্যের বীর্য থেকে সুগ্রীবের জন্ম হয় ।

বরাহপুরাণ অনুযায়ী ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গ থেকে ধর্মের জন্ম হয় । বামনপুরাণ মতে ধর্মের স্ত্রী অহিংসা। এর গর্ভে চারিটি পুত্র হয়–সন্যকার, সনাতন, সনক ও সনন্দ । মহাভারত অনুযায়ী ধর্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। পুরাণ মতে ধর্ম ও যম একই। বলা হয়েছে যে দেবগণের মধ্যে যম সর্বাপেক্ষা পূণ্যবান বলে ওঁর নাম ধর্মরাজ । কিন্তু তার জন্মবৃত্তান্ত ভিন্ন দেওয়া আছে। সূর্যের ঔরসে ও তার স্ত্রী সংজ্ঞার গর্ভে যমের জন্ম বলা হয়েছে। যম পাপ পুণ্যের বিচারকর্তা । চিত্রগুপ্ত তাঁর পাপপুণ্যের হিসাবরক্ষক। ঋগ্বেদে বিবস্বান ও সরন্যুর সন্তান যম-যমী-যমজ ভ্রাতা ও ভগিনী । ঋগ্বেদে যমী যমের

সহবাস আকাঙ্খা করেছেন। (আগে দেখুন)। যমলোক মনুষ্যলোক হতে ৮৬,০০০ যোজন দূরে অবস্থিত।

পৌরাণিক যুগের তিন শ্রেষ্ঠ দেবতা- ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। শিবের কথা আমরা আগেই বলেছি। ব্রহ্মার কথা পরে বলব। এখানে বিষ্ণুর কথাই বলছি। বিষ্ণু বৈদিক দেবতা। বেদে বিষ্ণুকে সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন করা হয়েছে। পুরাণ মতে প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন । বিষ্ণুর দুই স্ত্রী–লক্ষ্মী ও সরস্বতী। পুত্র কামদেব। বিষ্ণু পালন কর্তা । বলা হয়েছে পৃথিবীর কল্যাণের জন্য দেবতাদের সাহায্য করবার জন্য ও দানব দলনের জন্য ইনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন । বিষ্ণুর এইরূপ আবির্ভাবকে অবতার বলা হয়। বিভিন্ন যুগে বিষ্ণু মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি–এই দশ অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রলয়সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় নারায়ণরূপে মনুষ্যদেহধারী হয়ে বিষ্ণু শেষনাগের ওপর শায়িত ছিলেন । এঁর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছিল । জগৎ সৃষ্টির কালে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানবকে হত্যা করে তাদের মেদ থেকে তিনি মেদিনী সৃষ্টি করেছিলেন।

মহাপ্রলয়ের শেষে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। জলে তিনি সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করেন । ওই বীজ অণ্ড হয়ে দুভাগে বিভক্ত হলে, একভাগ আকাশে ও অন্যভাগ ভূমণ্ডলে পরিণত হয়।

এরপর ব্রহ্মা মন থেকে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্তা, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভুগু, দক্ষ, নারদ এই দশজন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার স্ত্রী সরস্বতী ও দুই কন্যা দেবসেনা ও দৈত্যসেনা । দেবসেনা ষষ্ঠী নামেও পরিচিতা । ইনি মাতৃকাশ্রেষ্ঠ ও শিশুপালিকা। দেবসেনার ভগিনী দৈত্যসেনাকে একবার কেশীদানব হরণ করে নিয়ে গিয়ে জোর করে বিবাহ করে । ইন্দ্র দেবসেনাপতি কার্তিককে বলেন যে, এই কন্যার (দেবসেনার) জন্ম না হতেই ব্রহ্মা একে আপনার স্ত্রী বলে নিদিষ্ট করেছেন। কার্তিকের সঙ্গে এর বিবাহ হয়।

ব্রহ্মার প্রথমে পাঁচটা মুখ ছিল। একবার শিবকে তাচ্ছিল্য করায় শিব তঁর তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে ব্রহ্মার একটি মস্তক দগ্ধ করে । সেই থেকে ব্রহ্মার চার মস্তক । ব্রহ্মা চতুর্ভূজ ও রক্তবর্ণ। অপর এক কাহিনী অনুযায়ী বিশ্বকর্মা যখন অপ্সরা তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করে, এবং সৃষ্টির পর তিলোত্তম যখন দেবতাদের প্রদক্ষিণ করে, তখন তাকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চারদিকে চারটি মুখ সৃষ্টি হয় ।

অথর্ববেদে কামদেব স্রষ্টা হিসাবে পুজিত হয়েছেন। কিন্তু পুরাণে তিনি যৌনাকাঙ্খার দেবতা । মৎস্যপুরাণে আছে ব্রহ্মার হৃদয় হতে কামদেবের জন্ম । ব্রহ্মা নিজে তার শরে জর্জরিত হয়ে নিজ কন্যা শতরূপায় উপগত হন । মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে গিয়ে কাম শিবের তৃতীয় নয়নদ্বারা ভস্মীভূত হয়েছিল। অভিশাপের ফলে কাম শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করে। তারপর বিদ্যাধরদের পিতা হয়ে দেবত্ব লাভ করে । কামের স্ত্রী রতি। রতি দক্ষের কন্যা । ইনি যৌন আকাঙ্ক্ষার দেবী । কালিকাপুরাণ অনুযায়ী দক্ষ

নিজ কন্যা রীতিকে দেখিয়ে কামদেবকে বলেন, এ আমার দেহজাত কন্যা এবং গুণে তোমার অনুরূপ । এই বলে তিনি রতিকে কামদেবের হাতে সমর্পণ করেন । রতিকে দেখে দেবতারা তার প্রতি অনুরক্ত হন । শিবের অভিশাপের ফলে কামদেব যখন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করে, রতি তখন মর্ত্যলোকে তাঁর স্ত্রী মায়াবতী রূপে জন্মান ।

কুবের মহাদেবের ধনরক্ষক। পিতা পৌলস্ত্য বা বিশ্রবা, মাতা ভরদ্বাজ-কন্যা দেববর্ণিনী । ব্রহ্মার বরে তিনি উত্তর দিগন্তের দিকপাল ও ধনাধিপতি হন। ব্রহ্মা তার আবাসস্থান নির্দেশ না করায় পিতার নির্দেশে ত্রিকুট-শিখরস্থ লঙ্কাপুরীতে গিয়ে বাস করেন। কিন্তু কুবেরের বৈমাত্রেয় ভাই রাবণ লঙ্কাপুরীর অধিকার চাইলে, পিতার উপদেশে লঙ্কা ত্যাগ করে কৈলাসে যান। সেইখানেই তঁর বাসস্থান ঠিক হয়। কুবের একদা হিমালয়ে তপস্যাকালে দৈবাৎ দেবী রুদ্রাণীকে দর্শন করেন। ফলে তার দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ ও বামচক্ষু ধূলিকলুষিত ও পিঙ্গলবর্ণ হয় । বহু বৎসর ধরে কঠোর তপস্যায় মহেশ্বরকে প্রীত করেন ও তার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। কুবেরের চেহারা খুব কুৎসিৎ ছিল। তার তিনটি পা ও আটটি দাঁত ছিল । আহুতি তাঁর স্ত্রী, নলকুবের ও মনিগ্রীব তাঁর দুই পুত্র ও মীনাক্ষী তাঁর কন্যা । কুবের যক্ষরাজ নামেও পরিচিত ।

মুনি-ঋষিদের যৌনজীবন

“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।” এটাই ছিল প্রাচীন ভারতের যৌন জীবনের সনাতন ধর্ম। নরক থেকে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করবার জন্যই পুত্র উৎপাদন করা হত। সেজন্য ধর্মশাস্ত্রকারগণ পুত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন । এটা যে সাধারণ লোকের জন্যই ব্যবস্থিত হয়েছিল, তা নয়। মুনি-ঋষিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। অগস্ত্য ও জরৎকারু মুনির কাহিনী এ সম্মন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে । তার মানে, মাত্র সাধারণ মানুষরাই যে বিবাহ করতেন, তা নয়। মুনিঋষিরাও করতেন। ঋষিদের মধ্যে সপ্তর্ষিরাই হচ্ছেন প্রধান, কেননা তাঁরা হচ্ছেন মন্বন্তর বা যুগ প্রবর্তক । সপ্তর্ষিরা হচ্ছেন মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ট । এঁরা সকলেই বিবাহ করেছিলেন । এঁদের স্ত্রীদের নাম যথাক্রমে কলা, অনুসূয়া, ক্ষমা, হবিভূ, সন্নতি, শ্রদ্ধা ও অরুন্ধতী। পদ্মপুরাণ অনুযায়ী এঁরা সকলেই লোকজননী ।

মুনিঋষিরা যে মাত্র নিজ পূর্বপুরুষদের মঙ্গলের জন্যই বিবাহ করতেন, তা নয়। রাজারাজড়ারাও তাদের ডাকতেন। তঁদের দিয়ে নিজ নিজ স্ত্রীদের গর্ভে পুত্র উৎপাদনের জন্য ।

সাধারণ মানুষের মত মুনিঋষিদেরও যৌনবাসনা থাকত। আমরা অনেক ঊর্ধ্বরেতা মুনিঋষিদের দেখি, সুন্দরী অপ্সরাদের দেখে রেতঃপাত করছেন। (ঊর্ধ্বরেতা মানে যার

বীর্য উর্ব্বরেতা হয়েছে, এবং যার কখনও রেতঃস্থলন হয় না) । মাত্র পাণ্ডবরাই বহুপতিক ছিলেন না । মুনিঋষিরাও ছিলেন । গৌতমবংশীয়া জটিলা সাতটি ঋষিকে একসঙ্গে বিবাহ করেছিলেন । আবার বার্ক্ষী নামে অপর এক ঋষিকন্যা একসঙ্গে দশ ভাইকে বিবাহ করেছিলেন ।

।। দুই ।।

অগস্ত্য ও জরতকারু কাহিনী নিয়েই শুরু করা যাক । অগস্ত্য বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । বশিষ্টও একজন বড় ঋষি । ইনি সূর্যবংশের কুলগুরু ও কুল-পুরোহিত। আদিত্য যজ্ঞে মিত্র ও বরুণ উর্বশীকে দেখে যজ্ঞ কুম্ভের মধ্যে শুক্রপাত করেন। সেই কুণ্ডে পতিত শুক্র হতে অগস্ত্য ও বশিষ্টের জন্ম হয় । অগস্ত্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি চিরকাল অকৃতদার থাকবেন । কিন্তু একদিন ভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেলেন যে তাঁর পিতৃপুরুষরা এক গুহার মধ্যে পা উপরে ও মাথা নীচের দিকে করে ঝুলছেন। তাদের জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারলেন যে বংশরক্ষা না করলে তঁদের সদগতি নেই। তখন অগস্ত্য বিবাহ করা স্থির করলেন । নিজ তপোবলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ অংশ নিয়ে তিনি এক পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্টি করলেন। সমস্ত জীবের সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ অংশ এই নারী লোপ করে নিয়েছিল বলে, এই নারীর নাম হল লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রাকে পালন করবার ভার তিনি বিদর্ভরাজের ওপর দিলেন । মেয়েটি বড় হলে, অগস্ত্য তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। তখন তিনি লোপমূদ্রাকে সম্বোধন করে বললেন—“প্রিয়ে ! তোমার অভিলাষ বল, তুমি আমার দ্বারা কতগুলি সন্তানের জননী

হতে চাও, একটি, না একশত, না এক সহস্র ?” এরপর অগস্ত্য দৃঢ়স্যু নামে এক পুত্র উৎপাদন করলেন ।

জরতকারু ছিলেন একজন ঊর্ধ্বরেতা, ব্রহ্মচারী, মহাতপা মুনি। একদিন ভ্রমণ করতে করতে তিনি কতকগুলি লোককে নীচের দিকে মাথা করে বৃক্ষ শাখা থেকে ঝুলতে দেখলেন। প্রশ্নের উত্তরে তারা বললেন যে জরতকারু নামে তাদের এক পুত্র বিবাহ ও সন্তান উৎপাদন না করায় তাঁরা বংশলোপের আশঙ্কায় এরূপভাবে ঝুলছেন। জরতকারু আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন যে পিতৃপুরুষদের মুক্তির জন্য তিনি সমনামা কোন মেয়েকে বিবাহ করতে পারেন, যদি ওই মেয়ের আত্মীয়রা স্বেচ্ছায় তাঁকে ভিক্ষাস্বরূপ কন্যা দান করে । তারপর জরতকারু মুনিকন্যাভিক্ষায় বেরিয়ে বাসুকীর ভগিনী জগৎকারুকে বিবাহ করেন । বিয়ের শর্ত হয় যে তিনি স্ত্রীর ভরণপোষণ করবেন না এবং স্ত্রী কিছু অন্যায় করলে তাকে ত্যাগ করবেন । কিছুদিন পরে জরতকারুর একটি পুত্র হয়। একদিন মহর্ষি নিজ স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে নিদ্রিত আছেন । এমন সময় সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদির সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে দেখে স্ত্রী মহর্ষির নিদ্রাভঙ্গ করেন । এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে মহর্ষি স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যান ।

।। তিন ।।

সপ্তর্ষিদের অন্যতম বশিষ্টের স্ত্রী অরুন্ধতী কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবাহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । পতিভক্তি ও পাতিব্রত্যের জন্য তিনি আদর্শ রমণী বলে গণ্য হন।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে লিখিত আছে পতিসেবারূপ ধর্মপথ যে নারী অনুসরণ করেন, তিনি অরুন্ধতীর মত স্বর্গেও পূজিত হন। সেজন্য বিবাহের কুশণ্ডিকাকালে মন্ত্র উচ্চারণের সময় নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখানো হয়। বশিষ্ঠের শতপুত্র ছিল। কল্মাষপদ রাক্ষস বশিষ্টের শতপুত্রের সকলকেই ভক্ষণ করে। একমাত্র জ্যেষ্টপুত্র শক্তির স্ত্রী অদৃশ্যন্তী গর্ভবতী ছিল। তার গর্ভেই পরাশরের জন্ম হয় । একদিন মৎস্যগন্ধা নামে এক ধীবর কন্যা যমুনায় নৌকা পারাপারে নিযুক্ত ছিল। পরাশর তখন সেই নৌকায় যাচ্ছিলেন। মৎস্যগন্ধাকে দেখে পরাশর কামাতুর হয়ে মৎস্যগন্ধার কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করেন । সেই সঙ্গমের ফলেই বেদের বিভাগকর্তা ও পুরাণসমূহের রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসের জন্ম হয়।

কল্মাষপাদের কথা এখনও শেষ হয়নি । একদিন পথিমধ্যে কল্মাষপাদ বশিষ্টকে দেখে, তাঁকেও খেতে গেলে, বশিষ্ট কল্মাষপাদের গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলে কল্মাষপাদ শাপমুক্ত হন ও নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন করতে থাকেন । তিনি বশিষ্টকে তার স্ত্রীর গর্ভে এক সন্তান উৎপাদন করতে বলেন । বশিষ্টের সঙ্গে এই সঙ্গমের ফলে রাজমহিষী গর্ভবতী হন । কিন্তু ১২ বছর কেটে গেলেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। তখন রাজমহিষী এক পাষাণখণ্ড দিয়ে নিজের উদর বিদীর্ণ করে এক পুত্র প্রসব করেন । এই পুত্রের নাম অশ্মক ।

।। চার ।।

বিশ্বামিত্র বৈদিক যুগের একজন ব্রহ্মর্ষি এবং ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের মন্ত্রগুলির অভিবক্তা। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও কঠোর তপস্যাবলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাত করেন। তিনি ঊর্ধ্বরেতা ঋষি । এক সময় পুষ্করতীর্থে তিনি উগ্র তপস্যায় রত ছিলেন। সেই সময় ইন্দ্রের প্রেরণায় অপ্সরা মেনকা পুষ্করতীর্থে স্নান করতে গেলে, বিশ্বামিত্র তার রূপে মুগ্ধ হন এবং তাঁর সহবাসে দীর্ঘ দশবছর অতিবাহিত করেন । এই সহবাসের ফলে মেনকার গর্ভে শকুন্তলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মেনকা কন্যাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। পরিত্যক্ত কন্যাকে কণ্বমুনি পালন করেন ।

গালব বিশ্বামিত্রের প্রিয় শিষ্য । শিক্ষান্তে বিশ্বামিত্র তাকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন। গা্লব গুরু দক্ষিণা দিতে চান । বিশ্বামিত্র বলেন তিনি এমন ৮০০ অশ্ব গুরুদক্ষিণ চান, যাদের কান্তি চন্দ্রের মত শুভ্র এবং একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ। গালিব রাজা যযাতির কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানায়। যযাতি এতগুলো অশ্ব দান করতে অসমর্থ হয়ে, গালবের হাতে নিজ কন্যা মাধবীকে দিয়ে বলেন যে, এই কন্যাকে নিয়ে তুমি রাজাদের হাতে সমর্পণ করলে কন্যার শুল্কস্বরূপ তারা ৮০০ অশ্ব দান করবেন ও তিনি দৌহিত্র পাবেন । গালব প্রথমে অযোধ্যার রাজা হর্যশ্বের কাছে যায় । রাজা হর্যশ্ব বলেন যে তাঁর মাত্র ২০০ অশ্ব আছে এবং তিনি এই কন্যার গর্ভে মাত্র একটি পুত্র উৎপাদন করতে চান। তখন মাধবী গালিবকে বলে– 'এক মুনির বরে প্রত্যেকবার প্রসবের পর আমি কুমারী থাকব । অতএব আপনি ২০০ অশ্ব নিয়ে আমাকে এঁর হাতে দান করুন । পরে আরও তিনজন রাজার কাছে আমাকে দান করলে আপনার ৮০০ অশ্ব পূর্ণ হবে, এবং আমার চারপুত্র লাভ হবে।' এরপর গালব এইভাবে আরও ৪০০ অশ্ব সংগ্রহ করে, এবং

বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়ে বলে, আপনি ৬০০ অশ্ব গ্রহণ করুন, আর বাকী ২০০ অশ্বের পরিবর্তে মাধবীকে গ্রহণ করুন । বিশ্বামিত্র মাধবীকে গ্রহণ করেন, এবং তার গর্ভে এক সন্তান উৎপাদন করেন ।

চ্যবন মহর্ষি ভৃগু ও পুলোমার পুত্র। দীর্ঘকাল তপস্যা করে চ্যবন । জরাগ্রস্ত হন ও বাল্মীকি স্তুপে পরিণত হন। একদিন রাজা শর্যাতি তাঁর ৪০০০ স্ত্রী ও সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে সেখানে বিহার করতে আসেন । বাল্মীক স্তুপ মধ্যে চ্যাবনের খদ্যোৎবৎ দীপ্যমান দুই চক্ষু দেখে সুকন্যা কৌতুহলবশতঃ, কাঁটা দিয়ে তা বিদ্ধ করে। চ্যাবনের অভিসম্পাতে রাজার সৈন্যদের মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ হয়ে যায়। শর্যাতি এর কারণ জানতে পেরে চ্যাবনের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন। চ্যবন বলেন, এই কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দিলে তিনি তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন । একদিন স্নানান্তে নগ্ন সুকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাকে প্রার্থনা করেন । সুকন্যা তার স্বামীর প্রতি অনুরক্ত বলে জানান । প্রীত হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তখন চ্যবনকে তার পুর্নযৌবন দান করেন। সুকন্যার গর্ভে চ্যাবনের প্রমতি নামে এক পুত্র হয়।

।। পাঁচ ।।

ঋষি উতথ্যের ঔরসে ও মমতার গর্ভে ঋষি দীর্ঘতমার জন্ম হয় । মমতা যখন গর্ভবতী ছিল, তখন তার দেবর দেবগুরু বৃহস্পতি তার সঙ্গম প্রার্থনা করে। মমতা বলে– ‘তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হতেই আমার গর্ভ হয়েছে, তোমার বীর্য অমোঘ্য, সুতরাং এরূপ

সঙ্গম থেকে বিরত হও ।' গর্ভস্থ শিশু বৃহস্পতিকে রেতঃপাত করতে নিষেধ করে। কিন্তু বৃহস্পতি শিশু ও তার মার কথা না শুনে, মমতার অসম্মতিতে রেতঃপাত করেন । শিশু নিজের পা দিয়ে শুক্র প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। এতে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ শিশুকে অভিসম্পাত করে–'তুমি দীর্ঘতামসে প্রবিষ্ট হবে অর্থাৎ অন্ধ হবে । উতথ্যের এই পুত্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে ও এর নাম হয় দীর্ঘতমা । যত্রতত্র সঙ্গম করার জন্য অন্য মুনিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। দীর্ঘতমার স্ত্রী প্রদ্বেষীও স্বামীর আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে স্বামীকে ত্যাগ করে, ও তাকে ভেলায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয় । অসুররাজ বলি স্নানের জন্য গঙ্গায় এসে ভাসমান দীর্ঘতমাকে তেজস্বী দেখে নিজ স্ত্রী সুদেষ্ণায় গর্ভে পুত্র উৎপাদনের জন্য তাকে নিজ গৃহে নিয়ে আসেন । সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, ও সুহ্ম নামে পাঁচপুত্র উৎপাদন করেন ।

।। ছয় ।।

কশ্যপ একজন বিখ্যাত ঋষি । শ্রীমদভাগবত মতে মরীচি এর পিতা ও কলা এর মাতা । ইনি দক্ষ প্রজাপতির তেরোটি মেয়েকে বিবাহ করেন । এই কন্যারাই ত্রিজগতের সমস্ত লোকের জননী । কশ্যপের ছেলে বিভাণ্ডক মুনি । বিভাণ্ডক মুনি দীর্ঘকাল তপস্যায় শ্রান্ত হয়ে কোন হ্রদে স্নানরত ছিলেন । সেই সময় স্বর্গের অপ্সর উর্বশীকে দেখে কামার্ত হয়ে জল মধ্যে রেতঃপাত করেন । এক তৃষিত হরিণী সেই রেতমিশ্রিত জল পান করাতে গর্ভিনী হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে প্রসব করে। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে রাজা দশরথের কন্যা শান্তার বিবাহ হয়।

।। সাত ।।

উদ্যালকও একজন বিখ্যাত ঋষি । এর পুত্রের নাম শ্বেতকেতু । একদিন শ্বেতকেতু তাঁর পিতার নিকট বসেছিলেন । এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ এসে তাঁদের সামনেই তাঁর মাতাকে যৌন আবেদন জানায় ও বলপূর্বক তার হাত ধরে নিয়ে যায় ও তার সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হয়। এতে শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠায়, উদ্দালক পুত্রকে বলেন- "হে পুত্র! ক্রুদ্ধ হয়ে না, এটাই সনাতন ধর্ম। গাভীদের ন্যায় স্ত্রীরাও অরক্ষিতা ।" শ্বেতকেতু এই বাক্য অস্বীকার করে, এবং স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রবর্তন করেন যে, যে নারী নিজ পতি ভিন্ন অপর পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করবে এবং যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হবে, তারা উভয়েই ভ্রূণহত্যার পাপে নিমগ্ন হবে ।

।। আট ।।

মহর্ষি চুলি একজন ঊর্ধ্বরেতা শুভাচারী ও দ্যুতিমান ঋষি ছিলেন । রামায়ণের আদিকাণ্ডে আমরা পড়ি যে মহর্ষি চুলি ভীষণ তপস্যায় রত ছিলেন । সোমদা নামে এক গন্ধর্ব কন্যা তার সেবা করত । সোমদার প্রার্থনা মত সেই মহাষি তার গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামে একজন বিখ্যাত ব্রহ্মতপঃ সমন্বিত পুত্র উৎপাদন করে। রাজা কুশীনাভ তার হাতে তাঁর শত কন্যাকে সম্প্রদান করেন । পবনদেব একবার কুশীনাভের এই একশত কন্যাকে ধর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন । মেয়েগুলি পবনদেবের এই অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করলে,

পবনদেব তাদের কুব্জা করে দেন । কিন্তু বিবাহের পর ব্রহ্মদত্ত ওই কন্যাদের স্পর্শ করা মাত্র, তারা বিকুব্জা, ও পরামশোভান্বিত হয়।

রামায়ণের আর এক কাহিনী অনুযায়ী মাণ্ডকনি ঋষি মাত্র বায়ু আহার করে দশ হাজার বছর ঘোর তপস্যা করে । তাতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা ভীত হয়ে তার তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য পাঁচজন অপ্সরাকে পাঠিয়ে দেন। মাণ্ডকনি তাদের রূপে মুগ্ধ হয়ে, তাদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে এক সরোবরের মধ্যে গুপ্ত গৃহ নির্মাণ করে সুখে বাস করতে থাকে। রাম বনবাসকালে এই সরোবরের নিকট এসে জলশূন্য সরোবর থেকে সঙ্গীত ধ্বনি উঠছে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ।

।। নয় ।।

কানা-খোড়া ঋষিরাও মেয়েছেলের প্রতি লালায়িত হতেন । চক্ষুহীন ও পদহীন পরাবৃদ্ধ ঋষি কতকগুলি মেয়েকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, মেয়েগুলি ঋষিকে দেখেই পালিয়ে যায় । কন্যাগণকে পালাতে দেখে পরাবৃদ্ধ ঋষি সকলের প্রত্যক্ষে উঠে দাঁড়ালেন এবং পঙ্গুতা সত্বেও মেয়েগুলিকে ধরবার জন্য তাদের পিছনে ছুটলেন । (ঋগ্বেদ ২।১৫।০)।

।। দশ ।।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তে অগস্ত্য ও তাঁর স্ত্রী লোপামুদ্রা সম্বন্ধে এক বিচিত্র কাহিনী আছে। অগস্ত্য বহুকাল লোপামুদ্রার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করে শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন । তিনি জরাগ্রস্ত । নিরত জপতপে নিযুক্ত থাকেন । কিন্তু সেই অবস্থায় তাঁর হঠাৎ স্ত্রীসম্ভোগ করবার ইচ্ছা হয়েছে। তিনি প্রার্থনা করছেন – 'যদিও আমি জপ ও সংযমে নিযুক্ত, তথাপি ভোগপ্রাপ্তিসাধনের কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক আমার প্রণয়ের উদ্রেক হয়েছে। লোপামুদ্রা সমর্থ পতিতে সঙ্গত হউন, অধীরা যোষিৎ, বীর ও মহাপ্রাণ পুরুষকে উপভোগ করুক ।' (ঋগ্বেদ ১।১৭৯।৪) ।

।। এগার ।।

উপরে মুনি ঋষিদের যৌনজীবনের যে সব কাহিনী দেওয়া হয়েছে, তা থেকে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে, সেগুলি এখানে সংক্ষেপে বলছি। বিবৃত কাহিনীসমূহ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বপুরুষদের মঙ্গল সাধন করে নি। একমাত্র বিবাহ দ্বারাই সে মঙ্গল সাধিত হয়। অনেক সময় মুনি-ঋষির ব্রহ্মচর্য পালন ও তপস্যার দ্বারা ঊর্ধ্বরেত হতেন । কিন্তু একাধিক কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে সুন্দরী রমণী দর্শনে তাদের রেতের আবার অধোগতি হত। বিবাহ যে মাত্র পুরুষদের পক্ষেই বাধ্যতামূলক ছিল, তা নয় ; মেয়েদের পক্ষেও । মহাভারতের এক কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে মহাতপা মুনির মেয়ে শুভ্রা, বহু বর্ষ তপস্যার পর যখন স্বর্গে যেতে চাইল, তখন নারদ তার সামনে এসে বলল যে, "অনূঢ়া কন্যা কখনও স্বর্গে যেতে পারে না।" তাই শুনে শুভ্রা গালব মুনির ছেলে প্রাকশৃঙ্গকে বিবাহ করেছিল। মাধবীর

কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে একই কন্যার একাধিকবার বিবাহ হতে পারত । সধবা মেয়েরও দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্ভবপর ছিল। এরূপ কন্যাকে পুনর্ভু বলা হত। ঐরাবত দুহিতার স্বামী যখন গরুড় কর্তৃক নিহত হয়েছিল তখন অর্জুন তাকে বিবাহ করে তার গর্ভে ইরাবন নামে এক সন্তান উৎপাদন করেছিল। আবার গৌতম ঋষি যখন জনৈক নাগরিকের গৃহে ভিক্ষার্থে এসেছিল, তখন তাকে ভিক্ষাস্বরূপ এক বিধবা শূদ্রাণীকে দান করা হয়েছিল । গৌতম তাকে বিবাহ করে তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে । সধবার পক্ষেও দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রয়াসের দৃষ্টান্ত, নলের কোন সংবাদ না পেয়ে দময়ন্তীর দ্বিতীয়বার স্বয়ংবরা হবার চেষ্টা থেকে পাওয়া যায়। মাধবীর পর পর চার বার সন্তান প্রসবের পরও কুমারী থাকার প্রতিধ্বনি আমরা কুন্তীর যৌনজীবনেও পাই। বৃহস্পতির মমতার সঙ্গে সঙ্গম আমাদের দেবরণ প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দেয় । অনুরূপভাবে দীর্ঘতমা কর্তৃক সুদেষ্ণার গর্ভে সন্তান উৎপাদন, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচীনকালে ব্যাপকভাবে প্রচলিত নিয়োগ প্রথা ।

।। বারো ।।

ঋষিপত্নীরা যে সব সময়ই পতিব্রতা হতেন, তা নয়। অহল্যার দৃষ্টান্ত থেকেই আমরা বুঝতে পারি। অহল্যা ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও সে সময় কামার্তা ছিল বলে দুর্মতিবশতঃ ইন্দ্রের দ্বারা নিজের কামলালসা পরিতৃপ্ত করেছিল। অহল্যার অসতীপনা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না । কেননা, বাল্মীকি লিখে গেছেন যে ইন্দ্র অহল্যাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন "ঋতুকালং প্রতিক্ষ্যন্তে নাথিন সুসমাহিতে । সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ

সুমধ্যমে।” অহল্যা ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও দুর্বুদ্ধিবশত ও রমণার্থে কৌতুহলী হয়ে যে ইন্দ্রের অভিলাষ পূর্ণ করেছিলেন, তা বুঝতে পারা যায় এই থেকে যে অহল্যা কৃতার্থ ও পূর্ণমনোরথ হয়ে ইন্দ্রকে বলেছিল–“কৃতার্থস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো । আত্মানাঞ্চ মাঞ্চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌরাবৎ।।” সুতরাং অহল্যা যে সজ্ঞানে এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় কামলালসা পরিতৃপ্ত করবার জন্য রমণাভিলাষ পূর্ণ করেছিলেন এবং নিজে ‘কৃতার্থা ও পূর্ণমনোরথা হয়েছিলেন’ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এবার শ্বেতকেতু কাহিনী সন্মন্ধে কিছু বলব। পণ্ডিতরা সাধারণত বলেন যে শ্বেতকেতুই ভারতবর্ষে প্রথম বিবাহ প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন । কিন্তু পূর্বে বিবৃত কাহিনী থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তার আগেই শ্বেতকেতু তার পিতামাতার সঙ্গে পরিবার মধ্যে বাস করতেন । তিনি মাত্র পাতিব্রত্য সন্মন্ধে নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন ।

মৈথুনের মল্লবীর

অভিধানে 'দক্ষ' শব্দের অর্থ দেওয়া আছে 'নিপুণ, পটু ।' সেই অর্থে 'মৈথুনধর্মে দক্ষ' মানে মৈথুন কর্মে পটু। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই অভীধা মাত্র একজনকেই দেওয়া হয়েছে। তিনি হচ্ছেন কণ্ডু মুনি । আমরা একবার উল্লেখ করেছি যে একবার অপ্সরা প্রম্লোচ্চাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল কণ্ডু মুনির তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য। এর বিশদ বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে। সেই বিবরণ অনুযায়ী পূর্বকালে বেদবিদগণের শ্রেষ্ঠ কণ্ডু নামে এক মুনি গোমতীতীরে পরম তপস্যায় রত ছিলেন। ইন্দ্র কণ্ডুর চিত্তবিকার উৎপাদনের জন্য প্রম্লোচ্চা নামী এক সুন্দরী অপ্সরাকে পাঠিয়ে দেন। প্রম্লোচ্চা কণ্ডুর চিত্তবিকার ঘটায় । কণ্ডু তার সঙ্গে মন্দার পর্বতের এক দ্রোণীতে (দুটি শৈলের সন্ধিস্থলে) বাস করে একশত বৎসর তার সঙ্গে সঙ্গমে রত হন । একশত বর্ষ উত্তীর্ণ হলে প্রম্লোচ্চা কণ্ডুকে বলে– 'হে ব্রাহ্মনী! আমি স্বগে যাইতে ইচ্ছা করি। প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা দাও।' কিন্তু কণ্ডু। তৎপ্রতি আসক্ত হয়ে বলেন- 'ভদ্রে । আরও কিছু দিন থাক।' কৃশাঙ্গী প্রম্লোচ্চা আবার তার সঙ্গে এক শত বৎসর সহবাস করল । একশত বৎসর পরে প্রম্লোচ্চা আবার কণ্ডুকে বলল– 'হে ভগবান ! অনুজ্ঞা দাও, আমি স্বর্গে যাই।' পুনশ্চ একশত বৎসর গত হইলে শুভাননা ওই অপ্সরা প্রণয়ের মৃদুহাস্যসহ মধুর বাক্যে বলল– 'ব্রহ্মণ ! আমি স্বর্গে যাই।' কিন্তু কণ্ডু তাকে আলিঙ্গন করে বলল– 'সুভ্রু ! ক্ষণকাল থাক, চিরকালের নিমিত্ত যাইবে ।' তখন তাঁর শাপের ভয়ে ভীত হয়ে অঙ্গরী আরও দুশো বছর ওই ঋষির কাছে রইল । তারপর বার বার স্বর্গে ফিরে যেতে চাহিলে

মুনি কেবল তাকে 'থাক' 'থাক' বলতে লাগলেন। প্রম্লোচ্চা শাপভায়ে মুনিকে পরিত্যাগ করল না । "তয়া চ রমতস্তস্য মহর্ষেস্তদহর্নিশম । নবং নবমভূৎ প্রেম মন্মথাবিষ্টচিতসঃ।।" তার মানে মন্মথাবিষ্টচিত্ত মহর্ষি তার সঙ্গে অহর্নিশি (দিবা রাত্রি) রমন করতে থাকলে, নব নব প্রেমের উদ্রেক হতে লাগল। এইভাবে মুনি প্রম্লোচ্চার সঙ্গে ৯৮৭ বৎসর ছয়মাস তিন দিন আনন্দ উপভোগ করল । এজন্যই কণ্ডুকে মৈথুন দক্ষ বলা হয়। এই সংসর্গের ফলে কণ্ডুর ঔরসে ও প্রশ্লোচ্চার গর্ভে মারিষা নামে এক কন্যা হয়। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী মারিষার গর্ভে প্রজাপতি দক্ষ জন্ম গ্রহণ করে ।

।। দুই ।।

যদিও পুরাণে একমাত্র কণ্ডুকেই 'মৈথুন দক্ষ' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল তা হলেও প্রাচীনকালে আরও অনেকেই এই অভীধার দাবী রাখতেন। আমরা আগেই দেখেছি যে অগস্ত্য মুনি যখন লোপামুদ্রাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি লোপামুদ্রাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন "প্রিয়ে! তোমার অভিলাষ আমাকে বল, তুমি আমার দ্বারা কতগুলি সন্তানের জননী হতে চাও, একটি, না একশত, না এক সহস্র ?" আমরা আবার দেখছি পুরু যখন পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করে পিতাকে যৌবন দিয়েছিল তখন যযাতি এক হাজার বৎসর ইন্দ্রীয় সম্ভোগের পর পুনরায় পুত্র পুরুকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রীর কথাও তো শুনেছেন ? তবে যা শুনেছেন, তার মধ্যে একটু ভুল আছে। সংখ্যাটা ষোল হাজার নয়। পুরাণ অনুযায়ী ষোল হাজার একশত। এ সম্মন্ধে লোকের আরও একটা ভুল বিশ্বাস আছে। লোকের ধারণা এরা সব গোপবালা ছিল। তা নয় । সকলেই নানাদেশ থেকে অপহৃত (abducted) মেয়ে ছিল। ('তাঃ কন্যা নরকেণাসন সর্বতে যা সমাহৃতাঃ", বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩১।১৪) । পুরাণে লিখিত আছে যে একই সময়ে পৃথক পৃথক ভাবে গোবিন্দ সেই সকল কন্যার ধর্মানুসারে বিধি অনুযায়ী পাণিগ্রহণ করেছিলেন, যাতে সেই সকল কন্যাগণ প্রত্যেকে মনে করেছিল যে শ্রীকৃষ্ণ মাত্র তাকেই বিবাহ করলেন । তা ছাড়া, প্রতিরাত্রেই তিনি তাঁদের প্রত্যেকের ঘরে গমনপূর্বক বাস করতেন । ("নিশাসু চ জগৎস্রষ্টা তাসাং গেহেষু কেশবঃ")

।। তিন ।।

প্রাচীনকালের এ সকল ব্যক্তির কথা পড়লে মনে হবে যে তারা সব যৌন শক্তিধর বা Sexual athlete ছিলেন। মৈথুন ধর্মটাই সেকালের সনাতন ধর্ম ছিল । কেননা মনু ও শতরূপা যখন ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল–"পিতঃ কোন কর্মের দ্বারা আমরা আপনার যথোচিত সেবা করব ?" ব্রহ্মা বলেছিলেন—"তোমরা মৈথুন কর্মদ্বারা প্রজা উৎপাদন কর। তাতেই আমার তুষ্টি।" পরবর্তীকালে এটাই "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা"–এই বচনে প্রকাশ পেয়েছিল। এটাই বায়োলজির পরম সত্য ।

হিন্দুদের কা/মশাস্ত্র

যৌ*মিলন নিয়ে অনুশীলন ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকে অনুসৃত হয়েছে। এরূপ অনুশীলনমূলক গ্রন্থগুলিকে কা/মশাস্ত্র বলা হত । রতিসম্ভোগের প্রয়োজনীয়তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সুক্তে ! তবে কা/মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনুশীলনেরও উল্লেখ পাওয়া যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।২।১২-১৩ ; ৬।৪।২-২৮)। সেখানে খোলাখুলিভাবে বলা হয়েছে যে রমণের সময় যদি নারীর কামোদ্রেক করাতে চাও, তা হলে যোনির ওষ্ঠপৃষ্ঠ জিহবা দ্বারা লেহন করবে । (৬।৪।৯) । পরবর্তীকালে বাৎসায়নের কা*সূত্রই প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু বাৎসায়নের উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বাৎসায়নের পূর্বে বহু আচার্যই এ সম্বন্ধে অনুশীলন করেছিলেন। বাৎসায়ন বলেছেন– 'প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করবার পর, তাদের রক্ষার জন্য ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ, কা/ম) সাধনের জন্য লক্ষ অধ্যায়ে এক শাস্ত্র উপদেশ দেন । তারই একাংশ অবলম্বন করে স্বায়ম্ভুব মনু ধর্মশাস্ত্র রচনা করেন । আর এক অংশ অবলম্বন করে বৃহস্পতি অর্থশাস্ত্র রচনা করেন । অন্য এক অংশ অবলম্বন করে মহাদেবের অনুচর নন্দী এক হাজার অধ্যায়ে কা/মশাস্ত্র রচনা করেন। পরে উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু তাকে ৫০০ অধ্যায়ে সংক্ষেপিত করেন । তারপর পাঞ্চালাদেশীয় আচার্য বাভ্রব্য আরও সংক্ষিপ্ত একটা গ্রন্থ রচনা করেন । এতে সাতটা অধিকরণ ও ১৫৯ অধ্যায় ছিল । পরে এক একটা অধিকরণ নিয়ে এক একজন আচার্য বিভিন্ন বিষয়ে কা/মশাস্ত্র রচনা করেন । যথা, দত্তকাচার্য পাটলিপুত্রের বারযোষিতদের নিয়ে বৈশিক অধিকরণ রচনা করেন,

গোর্নদীয় ভার্যাধিকারিক, গোনিকাপুত্র পারদারিক, সুবর্ণাভ সাম্প্রোয়াগিক, ও কুচুমার ঔপনিষদিক অধিকরণ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।' বাৎসায়ন তারপর বলছেন 'বহু আচার্য কর্তৃক কা/মশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় সন্মন্ধে বহু খণ্ড খণ্ড গ্রন্থ রচনার ফলে, সমগ্র কা/মশাস্ত্র নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল। দত্তকাচার্য, গোর্নদীয়, গোনিকাপুত্র, সুবর্ণাভ, কুচুমার প্রভৃতি আচার্যগণ কর্তৃক রচিত গ্রন্থগুলি কা/মশাস্ত্রের এক এক বিশেষ বিষয় সম্পর্কে রচিত হয়েছিল, আর বাভ্রব্য রচিত গ্রন্থখানি আকারে বিশাল বলে সাধারণের পক্ষে তা পাঠ করা দুঃসাধ্য ছিল। সেজন্য পূর্বসূরীদের এই সকল গ্রন্থ অবলম্বন করে স্বল্প আয়তনের মধ্যে 'কা*সূত্র' রচিত হল ।' এই হচ্ছে বাৎসায়নের কা*সূত্র রচনার ইতিহাস। বাৎসায়নের 'কা*সূত্র' খানি ঠিক কবে রচিত হয়েছিল, তা আমাদের জানা নেই। তবে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এখানা খৃষ্টজন্মের এদিক-ওদিকে দুই-এক শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল। উপরে উদ্ধৃত বাৎসায়নের উক্তি থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে বাৎসায়নের সময় পর্যন্ত বাভ্রব্য রচিত বৃহৎ গ্রন্থখানিই কা/মশাস্ত্র সম্বন্ধে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ ছিল । বাৎসায়নই বাভ্রব্যের লুপ্তপ্রায় গ্রন্থখানির সার সংগ্রহ করে সূত্রকারে 'কা*সূত্র' রচনা করেন । বাৎসায়নের প্রকৃত নাম ছিল মল্লনাগ । পরবর্তীকালে বাৎসায়নের গ্রন্থখানাই প্রাচীন ভারতের কা/মশাস্ত্রের সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি লাভ করে। এখানা ৩৬টি অধ্যায়ে, ৬৪ প্রকরণে ও সাত অধিকরণে বিন্যস্ত । সমগ্র বইখানির শ্লোক সংখ্যা হচ্ছে ১১২৫ ।। বাৎসায়ন রচিত গ্রন্থের অনেকগুলি টীকা রচিত হয়েছিল। তন্মধ্যে যশোধরের 'জয়মঙ্গলা" টীকাই প্রসিদ্ধ।

বাৎসায়নের 'কা*সূত্র'ই অবশ্য যৌ*সম্ভোগ সম্পর্কিত শেষ গ্রন্থ নয়। তবে বাৎসায়নের কা*সূত্রেই আছে শেষ কথা । কেননা, বাৎসায়নের পরে যাঁরা কা*শাস্ত্র সম্বন্ধে বই লিখেছিলেন, তাঁরা সবাই বাৎসায়নের 'কা*সূত্রে'র ওপরই নিজেদের রচনাসমূহ ভিত্তি করেছিলেন । যদিও বাৎসায়নের পরবর্তী লেখকগণ বাৎসায়নের উপরই নির্ভর করেছেন, তা হলেও তাঁরা মৈথুন-ভঙ্গীর (coital postures) অনেক কাল্পনিক বিবরণ দিয়েছেন । গণনা করে দেখা গিয়েছে যে এ সকল ভঙ্গীর মোট সংখ্যা হচ্ছে ৭২৯ ।

কা*শাস্ত্র সম্বন্ধে পরবর্তীকালে যে অগণিত গ্রন্থ লেখা হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখের দাবী রাখে (১) খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে বা নবম শতাব্দীর গোড়াতে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনীমত', (২) খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধভিক্ষু পদ্মশ্রীজ্ঞান রচিত 'নাগরসর্বস্ব', (৩) একাদশ শতাব্দীতে রচিত মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের বাৎসায়ন কা*সূত্রের পদ্য অনুবাদ ও 'সময়মাতৃকা' নামে বে*শ্যাদের সম্পর্কে একখানা বই, (৪) দ্বাদশ শতাব্দীতে কোক্কোক রচিত 'রতিরহস্য', এর অন্যূন চারখানা টীকা আছে, তার মধ্যে কাঞ্চীনাথের টীকাই প্রসিদ্ধ, (৫) চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিথিলার জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখর রচিত 'পঞ্চ সায়ক', (৬) পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জৌনপুরের কল্যাণমল্লর 'অনঙ্গরঙ্গ', এখানা ফার্সী, উর্দু, ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অনুদিত হয়েছে ; (৭) ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয়নগরের রাজা ইম্মাদি প্রৌঢ়দেবরায়ের 'রতিরত্নদীপিকা', (৮) সপ্তদশ শতাব্দীতে বিকানীরের রাজা অনুপসিংহের সভাকবি ব্যাসজনার্দনের 'কা/মাগ্রাবোধ' । এ ছাড়া, এ সময় আরও রচিত হয়েছিল অনন্তের 'কা/মসমূহ', রুদ্রের 'স্মরদীপিকা' হরিহরের 'শৃঙ্গারদীপিকা' ও জনৈক

জয়দেবের 'রতিমঞ্জরী' । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাপণ্ডিত ভারতচন্দ্র 'রাসমঞ্জুরী' নামে একখানা কা/মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ বাংলা পদ্যে রচনা করেন ।

বাৎসায়নের 'কা*সূত্র' নাগরিক সমাজের জন্য লিখিত হয়েছিল । নাগরিক সমাজের লোকেরা কিভাবে তাদের যৌ*জীবনকে সুখময় করে তুলত তারই পরিচয় বইখানাতে পাওয়া যায়। যত রকম পদ্ধতিতে (coital postures) মানুষ রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হতে পারে তার পরিচয় বাৎসায়নের বইয়ে আছে । বাৎসায়ন একটা বিশেষ রকম পদ্ধতিতে রমণের নাম দিয়েছেন 'ইন্দ্রানিক রতি' । সেখানে বলা হয়েছে যে ইন্দ্রানী শচী এই বিশেষ পদ্ধতিতে রতিক্রিয়া করতে ভালবাসতেন । সেজন্যই এর নাম 'ইন্দ্রানিক রতি' ।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরগাত্রে কামকলার অনেক নিদর্শন আছে । বহু স্থানে (যেমন ভুবনেশ্বরের রাজারাণী মন্দিরে) এমন অনেক দুঃসাহসিক ধরণের রমণমূর্তি আছে, যেগুলো দেখলে মনে হবে যে প্রাচীনকালের হিন্দুরা মৈথুনক্রিয়ার কৌশলে বিশেষ রকমের acrobats ছিলেন । মৈথুনক্রিয়ার এসকল পদ্ধতি বাৎসায়নের 'কামসূত্র'-এও বর্ণিত হয়েছে । সুতরাং এগুলো কামকলার যে অসম্ভব বা অবাস্তব পদ্ধতি তা নয় ।

মন্দিরগাত্রে এরূপ খোদিত কামকলার প্রদর্শনে রত নরনারীর মূর্তির কথা উঠলেই আমরা কোনারক, পুরী, ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের উল্লেখ করে থাকি । কিন্তু এই শ্রেণীর ভাস্কর্যের সংস্থান এত সঙ্কীর্ণ ভৌগলিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । এরকম মূর্তি মহারাষ্ট্রের ইলোরার শৈলমন্দিরে, মহীশূরের হলেবিদে অবস্থিত হরশৈলেশ্বরের মন্দিরে, পশ্চিম, মধ্য ও প্রাচ্য ভারতের বহু স্থানের মন্দিরে লক্ষ্য করা যায় । ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপর অবস্থিত এক নেপালী মন্দিরেও আমি এরূপ ভাস্কর্য লক্ষ্য করেছিলাম। বাঙলার মন্দিরের পোড়ামাটির অলংকরণেও এর নিদর্শনের প্রতুলতা কম নয়। এক হাওড়া জেলারই দশটা মন্দিরে মৈথুন অলংকরণ আছে। চব্বিশ পরগণারও অনেকগুলি মন্দিরে আছে। বস্তুতঃ বাঙলার মন্দিরে মিথন দৃশ্যের অলংকরণ অতি প্রাচীন । পাহাড়পুরে অবস্থিত পালযুগের মন্দিরসমূহের মিথবুনমূতিগুলি দেখলেই এটা বুঝতে পারা যায় ।

।। দুই ।।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে দেবতার মন্দিরে মিথন দৃশ্যের বিদ্যমানতার কারণ কি ? এটা বিংশশতাব্দীর শেষপাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা বুঝতে পারব না। আপাতদৃষ্টিতে মূর্তি বা দৃশ্যগুলির মধ্যে আমরা অশ্লীলতারই গন্ধ পাব ; কিন্তু ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে। পরবর্তীকালের সাহিত্য পড়লে আমরা বুঝতে পারব যে হিন্দুর কাছে সৃষ্টিই ছিল সবচেয়ে বড় ধর্ম । যে কর্মের মাধ্যমে যে ধর্ম পালিত হত, মিথন মূর্তিগুলি তারই সজীব প্রতীক মাত্র। প্রজাপতি ব্রহ্মাই প্রথম প্রজা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অন্তরের মধ্যেই ছিল সৃজন শক্তির উৎস। সেজন্যই তিনি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে গিয়েছিলেন সেই সুপ্ত শক্তিকে সঙ্গিনী হিসাবে পাবার জন্য। এক কথায় পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিলেন। ইহজগতে নারী ও পুরুষের মিলন, সেই বৃহত্তম মিলনেরই প্রতীক। এই মিলনের মধ্যেই আছে সৃষ্টি, কামনার নিবৃত্তি ও সুখ দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্তি । (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৪।৪-৮) ।

।। তিন ।।

যৌন মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টিকে সংরক্ষিত করবার জন্য আমরা ঋগ্বেদের ঋষিদের পরম ব্যাকুলতা লক্ষ্য করি। এই মিলনে যারা ব্যাঘাত ঘটায় তাদের বিনাশ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৬২ সূক্তে বলা হয়েছে—“যে তোমার যোনি আক্রমণ করে, অগ্নি তাকে

বিনাশ করুন। পুরুষের শুক্র সঞ্চারকালেই হােক অথবা গর্ভমধ্যে আন্দোলিত হবার কালেই হােক অথবা ভূমিষ্ঠ হবার সময় হােক, তোমার গর্ভকে যে নষ্ট করে বা নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তাকে আমরা এখান হতে দূরীভূত করলাম। গর্ভ নষ্ট করবার জন্য যে তোমার দুই উরু বিশ্লেষিত করে দেয়, অথবা যে ওই উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যস্থলে শয়ন করে অথবা যে যোনির মধ্যে বিপতিক পুরুষ শুক্রকে লেহন করে, তাকে এখান হতে দূরীভূত করলাম।" (ঋগ্বেদ ১।১৬২।১-৬)।

বিংশ শতাব্দীর উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট মানসিকতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যারা কপটভানের সঙ্গে মন্দির গাত্রের মিথন মূর্তি বা দৃশ্যগুলিকে অশ্লীল বলে ঘোষণা করেন, তাদের মনে রাখা উচিৎ যে তাদের পিতামাতার এই অশ্লীল কর্মদ্বারাই তারা ইহজগতের মুখ দেখতে পেয়েছেন । হিন্দুর সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে এ সম্বন্ধে কোন কপটতার ভান নেই। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে বলা হয়েছে–'মাতা পৃথিবী বৃষ্টির জন্য পিতা দ্যুলোককে কর্মদ্বারা ভজনা করেন । তার পূর্বেই পিতা মনে মনে এর সাথে সঙ্গত হয়েছিলেন এবং বিবিধ শস্য উৎপাদন হেতু পরস্পর পরস্পরের কথাবার্তা বলেছিলেন । (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৮) । বস্তুতঃ মৈথুন ক্রিয়াটা হিন্দুদের ধর্মচিন্তায় biology-র এক পরম সত্যের অভিব্যক্তি । সেজন্য প্রাচীন ঋষিরা কথায় কথায় মৈথুনক্রিয়ার কথা বলতে লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করতেন না । যেমন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে অরণীর সাহায্যে অগ্নি উৎপাদন মিথুন ক্রিয়ার সঙ্গে তুলিত হয়েছে। (৬।৪।২২) । বস্তুতঃ দেবায়তনে মিথুন মূর্তি প্রদর্শন যদি অশ্লীল ব্যাপার হয়, তা হলে তার চেয়ে কতগুণ অশ্লীল ছিল অশ্বমেধ

যজ্ঞে সর্বসমক্ষে প্রধান রাজমহিষীর অশ্বের সঙ্গে মৈথােন ক্রিয়ায় রত হওয়া বা প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গত হওয়া ?

।। চার ।।

খুব যুক্তিযুক্ত কারণে অনেকে অনুমান করেছেন যে মন্দির গাত্রের এই সকল মিথন মূর্তির সঙ্গে তান্ত্রিক ধর্মের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা প্রভাব ছিল। সকলেরই জানা আছে যে নারী সঙ্গমই তান্ত্রিক সাধনার ভিত্তি । বস্তুতঃ তন্ত্রগ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে যে মৈথন ছাড়া কুলপূজা হয় না । তান্ত্রিক সাধনায় মৈথুন কামমার্গ নয়, জ্ঞানমাে্গ । তন্ত্রমতে নারীর দুই স্বরূপ কামিনী ও জননী–একই। গোড়াতে প্রকৃতি কামিনী, সৃষ্টিতে সম্ভোগার্থে তার সার্থকতা । তারপর যখন সৃষ্টি হয়ে গেল, সেই সৃষ্ট জীবের অসহায় ও দুর্বল অবস্থায় তার লালন পালন ও বৃদ্ধির জন্যই তো জননী ভাব ! তান্ত্রিক সাধনায় রাত্রিকালে সাধক ‘আমি শিব’” (‘ধ্যাত্বা শিবোহমত্তি’) এইরূপে ভাবতে ভাবতে নগ্ন অবস্থায় নগ্ন রমণী রমন করত (‘ততো নগ্নাং স্ত্রিয়াং নগ্নং রমণ ক্লেদ যুতোহপিাবা”) রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নিজ সাধন কার্যে লিপ্ত থাকে। কুলানির্বতন্ত্র অনুযায়ী এই সাধন প্রক্রিয়া কি, তা এখানে উদ্ধত মূল শ্লোক থেকে বুঝা যাবে।

‘আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ চ স্তনয়োমর্দন স্তথা।
দর্শনং স্পর্শনং যোনির্বিকাশে লিঙ্গঘর্ষণম্।’

(লেখকের ‘হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষা’ গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৭১-৮৩ দেখুন) ।

।। পাঁচ ।।

পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে আমরা তান্ত্রিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। এই মন্দিরের তান্ত্রিক শক্তি হচ্ছেন বিমলা । বিমলা অধিষ্ঠিতা আছেন মাটির তলায় এক মন্দিরে । জগন্নাথ মন্দিরের চত্বর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেখানে যেতে হয় । জগন্নাথের উপাসনা বৈষ্ণব তন্ত্রমতে হয় । আরাধনার সময় পঞ্চ-’ম’কারের বিকল্প হিসাবে মৎস্যের পরিবর্তে হিঙ্গুমিশ্রিত সবজী, মাংসের পরিবর্তে ‘আদাপচেদি’, মদ্যের পরিবর্তে কাংস্য-পাত্রে নারিকেলের জল, মুদ্রার পরিবর্তে ‘কান্তি’ (গোধূমচূর্ণ ও শর্করা মিশ্রিত দ্রব্য) ও মৈথুনের পরিবর্তে দেবদাসীর নৃত্য ও অপরিজাতা ফুল উৎসর্গ করা হয়। আসল আমিষ দ্রব্য পুরীর মন্দিরে কখনও প্রবেশ করানো হয় না। কিন্তু বৎসরে একদিন এর ব্যতিক্রম করা হয়। সেদিনটা হচ্ছে মহাষ্টমীর দিন। মাত্র মহাষ্টমীর দিন পুরীর মন্দিরে বিমলার ভোগ রন্ধনের জন্য মৎস্য ব্যবহার করা হয়। যাঁরা মহাষ্টমীর দিন বিমলার ভোগ খেয়েছেন, তঁরা জানেন এটা মাছের পোলাও বিশেষ ।

আমি আগের এক অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতে সহাোদরা বিবাহের উল্লেখ করেছি। পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ সুভদ্রা-বলরাম বিগ্রহত্রয়ের সমাবেশ তারই ইঙ্গিত করে। এই সম্পর্কে আগে উদ্ধৃত কুলচূড়ামণি তন্ত্রের উক্তি স্মরণীয়। সেখানে বলা হয়েছে যে সাধনার সময়

যদি অপর নারী পাওয়া না যায়, তা'হলে নিজের কন্যা, নিজের কনিষ্ঠা বা জ্যেষ্ঠ ভগিনী, মাতুলানী, বা বিমাতাকে নিয়ে কুলপূজা করবে।

।। ছয় ।।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যে সব দুঃসাহসিক নারী-পুরুষ মৈথুনের মূর্তি আছে (মন্দিরের ভিতর ক্যামেরা নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না বলে) সে সব মূর্তির ছবি এখনও ছাপা হয় নি। সে গুলো দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে এক সময় শ্রীক্ষেত্র তান্ত্রিক সাধনারই এক পীঠস্থান ছিল । তবে পুরীর মন্দিরের মৈথুন মূর্তিগুলি সম্বন্ধে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে। সত্তর বছর আগে ওই মূর্তিগুলি আমি যখন প্রথম দেখি, তখন ওগুলো নানা রঙে রঞ্জিত ছিল । আজ আর ওগুলোর সে রূপ নেই। শালীনতা রক্ষার খাতিরে ওগুলোকে কলিচুন দিয়ে আবৃত করা হয়েছে ।

ভুবনেশ্বরে এক সময় ৭০০ মন্দির ছিল। সত্তর বছর আগেও আমি তিন-চারশ মন্দির দেখেছি। এখানেও মৈথুন মূর্তির ছড়াছড়ি । তবে রাজা রানী মন্দিরের মৈথুন মূতিগুলি হচ্ছে সবচেয়ে দুঃসাহসিক ধরণের ।

কোনারক পরিত্যক্ত মন্দির । এখানে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। সেজন্যই আমরা কোনারকের রমনমূর্তিগুলির সহিত বেশী পরিচিত। অনুরূপভাবে আমরা পরিচিত খাজুরাহোর মন্দিরের রমণ বিলাস মূর্তিগুলির সঙ্গে । এখানেও বহু দুঃসাহসিক ধরনের

রমন মূর্তি আছে। খাজুরাহােতেও এক সময় অগণিত মন্দির ছিল। তাদের মধ্যে এখনও গোটা পঁচিশ বিদ্যমান । নাগর রীতিতে গঠিত মন্দিরের এখানেই চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছিল। মূল দেবতার মন্দিরকে অবলম্বন করে এখানে ৬৪ যোগিনীর মন্দিরও রচিত হয়েছিল । এ থেকেই এগুলির তান্ত্রিক উৎপত্তি প্রকাশ পায় ।

।। সাত ।।

একটা প্রশ্ন এখানে খুব স্বাভাবিকভাবে উঠতে পারে । ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য তো খুব সুপ্রাচীন। তবে আগেকার যুগের ভাস্কর্যে মিথন মূর্তি না দেখিয়ে, হঠাৎ দশম একাদশ শতাব্দীর মন্দিরগুলিতে তার প্রথম আবির্ভাব ঘটল কেন ? মিথন মূর্তিগুলি যদি তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হয়, তা হলে এর ব্যাখ্যা খুবই সহজ । তান্ত্রিক সাধনসদৃশ ধর্মপদ্ধতি পূর্ব ভারতের জনগণের মধ্যে প্রাক-বৈদিক কাল হতে প্রচলিত ছিল । এর সাধন পদ্ধতি অতি গূঢ় বলে, এটা সুপ্ত অবস্থায় গোপনভাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় লুক্কায়িত ছিল। জনপ্রিয়তা লাভের জন্য বৌদ্ধ মহাযানীদের মধ্যেই তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুপ্রবেশ ঘটে। এর ফলে বজ্রযান নামে এক নূতন যানের সৃষ্টি হয়। বজ্রযানকে সহজযান বা সহজিয়া ধর্মও বলা হত । যাঁরা সহজপথে যান, তাদের আর জন্মমৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ফিরে আসতে হয় না। এই বৌদ্ধ চিন্তাধারাই আমরা চর্যাপদ-সমূহের মধ্যে লক্ষ্য করি। দেহই হচ্ছে এ সাধনার অবলম্বন । দেহভাণ্ডই হচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতি ব্রহ্মাণ্ড । মহাসুখের মধ্যে চিত্তের নিঃশেষ নিমজ্জনই হল পরম নির্বাণ । বৌদ্ধরা যখন তন্ত্রের গূহ্যসাধন পদ্ধতি প্রকাশ করে দিল, হিন্দুরা তখন আর চুপ করে বসে রইল না।

তারাও এই লোকায়ত গুহ্যসাধনা সম্বন্ধে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হল। পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সিদ্ধাচার্যদের সক্রিয় প্রভাবেই বৌদ্ধ বজ্রযান ধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সে জন্যই পালরাজগণের পূর্বের মন্দির ভাস্কর্যে আমরা মিথুন মূর্তির অভাব দেখি ।

।। আট ।।

অনেকে বলেন যে মাত্র রমণমূর্তিগুলির মাধ্যমেই যে সৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmic principle) বুঝানো হয়েছে, তা নয়। মন্দিরগুলোও স্ত্রী-পুরুষ রমণের প্রতীক । এসন্মন্ধে হেগেলই প্রথম মতবাদ প্রকাশ করেন যে শিখর বিশিষ্ট মন্দিরগুলো হচ্ছে পুংলিঙ্গের প্রতীক। তঁাকে সমর্থন করেন হারবার্ট রীড । আমার সহাধ্যায়ী বন্ধুবর প্রয়াত অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মন্দির নির্মাণ সন্মন্ধে ওড়িয়া ভাষায় রচিত শিল্পশাস্ত্র সমূহ গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে তার 'ক্যাননস্ অভ্ ওড়িশান আরকিটেকচার' । তিনিও ওই একই মত পোষণ করেন। ওড়িশার মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে 'রেখা।' রীতিতে গঠিত একটি মূল শিখর মন্দিরের সামনের দিকে সংযুক্ত করা হয় 'ভদ্র' রীতিতে গঠিত আর একটি মন্দির, যেন গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে নববধূর শাড়ীর সঙ্গে বরের বসনের। শিল্পশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে 'রেখ' পুরুষ, 'ভদ্র' নারী। তাদের সংযোগ যৌনসঙ্গমের প্রতীক । যে অলিন্দপথ ভদ্রাকে রেখ-এর জঙ্ঘার সঙ্গে সংযুক্ত করছে তা হচ্ছে স্ত্রীযোনির প্রতীক। এখানে স্মরণীয় যে মূল মন্দিরের প্রধানতম অংশকে 'গর্ভ' বলা হয় ।

এই আলোচনার পর এই কথাই বলতে চাই যে মন্দির গাত্রের মৈথুনমূর্তিগুলি অশ্লীল মানসিকতার পরিচায়ক নয়। রূপের পূজারী শিল্পী মন্দিরগাত্রে এসকল মূর্তি গঠন করে যে মাত্র সৃষ্টিতত্ত্বই বুঝাতে চেয়েছেন তা নয় ; জীবনরসের প্রবাহ ঢেলে স্বর্গ-মর্ত্য একসূত্রে গ্রন্থণাও করে গেছেন ।

বেদ-পুরাণ এর ইতিবৃত্ত

এই পুস্তকের প্রবন্ধসমূহ বেদ-পুরাণের ভিত্তিতে রচিত। সেজন্য পাঠকদের বেদ পুরাণ সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা উচিৎ। সেই কারণে বেদ-পুরাণ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলছি। নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজের কাছে বেদ-পুরাণ অপেক্ষা পবিত্র জিনিষ আর কিছু নেই। পুরাণগুলি পরে লেখা হয়েছিল, বেদই সকলের আগে রচিত। কিন্তু হিন্দুদের বিশ্বাস বেদ রচিত গ্রন্থ নয়, ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট বা শ্রুত । সেজন্য বেদকে শ্রুতি বলা হয় । সে যাই হোক, বেদই হচ্ছে মানবজাতির সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ। মোক্ষমূলর (Maximuller) তাঁর ঋগ্বেদের অনুবাদের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেছেন যে বেদ হচ্ছে–"the most ancient books in the library of mankind."

বেদ সংখ্যায় চারটি — ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ । এদের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রধান ও সবচেয়ে প্রাচীন । ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত । প্রত্যেক মণ্ডলে অনেকগুলি করে সূক্ত আছে। প্রতি সূক্ত আবার অনেকগুলি ঋক বা মন্ত্র নিয়ে রচিত । প্রতি সূক্ত হচ্ছে এক বা একাধিক দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত স্তুতি ।

।। দুই ।।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি দশটি মণ্ডলে বিভক্ত বলে, ঋগ্বেদকে 'দশতরী' বলা হয় । তবে এখন আমরা যাকে ঋগ্বেদ বলি, তা ছাড়া আরও ঋক সংহিতা ছিল। বর্তমান ঋগ্বেদ সংহিতা যে শাখার অন্তর্ভুক্ত, তাকে 'শাকল' শাখা বলা হয়। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে এরূপ একুশটি শাখার উল্লেখ করেছেন ('একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যম') । তবে বাকী শাখার সূক্তগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন মাত্র 'শাকল' শাখার সূক্তগুলিই জীবিত ।

উপরে যে দশটি মণ্ডলের কথা বলেছি, সে দশটি মণ্ডল 'শাকল' শাখার ঋকসংহিতার । এই দশটি মণ্ডলের সূক্ত-বিন্যাস একই রকমের নয়। প্রথম ও দশম মণ্ডলের প্রতিটির সূক্ত সংখ্যা হচ্ছে ১৯১। বাকী মণ্ডলগুলির সূক্ত সংখ্যা যথাক্রমে—দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪৩, তৃতীয় মণ্ডলের ৬২, চতুর্থ মণ্ডলের ৫৮, পঞ্চম মণ্ডলের ৮৭, ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫, সপ্তম মণ্ডলের ১০৭, অষ্টম মণ্ডলের ৯২ ও নবম মণ্ডলের ১১৪ । আগেই বলেছি যে মোট সূক্ত সংখ্যা হচ্ছে ১০১৭ । শাকল শাখার বিভিন্ন সংস্করণের অষ্টম মণ্ডলে (৮।৪৯-৫৯) এগারটি সূক্তকে 'বালখিল্য'সূক্ত বলা হয় । এই এগারটি সূক্ত নিয়ে মোট সূক্ত সংখ্যা হচ্ছে ১০২৮ । সংখ্যার বিসংগতি ছাড়া মণ্ডলগুলির আরও এক বৈশিষ্ট্য আছে । দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল পর্যন্ত সূক্তগুলি এক-একজন বিশেষ ঋষি বা তাদের বংশধরগণের রচিত। যথাক্রমে এই ঋষিগণ হচ্ছেন- গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ । এই ছয়টি মণ্ডল একএকজন বিশেষ ঋষি বা তাঁদের বংশধরগণের রচিত বলে সাহেবরা এগুলিকে 'ফ্যামিলি বুকস্' বলেন । অষ্টম মণ্ডলটি প্রধানত কন্বগোত্রীয় ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট 'প্রগাথ' মন্ত্রের সংকলন, আর নবম মণ্ডলটি নানা ঋষিগণ রচিত 'পবমান-সোম'-এর উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রসমূহের সমষ্টি । প্রথম ও দশম মণ্ডলের স্তোত্রগুলি নানা

ঋষির রচিত, এবং এগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সংযোজন বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন ।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সাধারণতঃ গায়ত্রী (২৪ অক্ষর), উষ্ণিহ (২৮ অক্ষর), অনুষ্টুপ (৩২ অক্ষর , বৃহতী (৩৬ অক্ষর), পঙক্তি (৪০ অক্ষর), ত্রিষ্টুপ (৪৪ অক্ষর), জগতী (৪৮ অক্ষর)–এই সাতটি ছন্দে রচিত ।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পরবর্তীকালের সংস্কৃত ভাষায় রচিত নয়। এগুলি আদি আর্যভাষায় রচিত । এর বিশেষ নাম হচ্ছে বৈদিক ভাষা । ঋগ্বেদে এমন অনেক শব্দ আছে (যথা বিশেষ্য পদ ও ক্রিয়াপদ) যা পরবর্তীকালের সংস্কৃত ভাষায় দেখতে পাওয়া যায় না । তা ছাড়া, পরবর্তীকালে শব্দের মূল আদিম অর্থও পরিবর্তিত হয়েছে। তার জন্য ঋক মন্ত্রগুলির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। এই অর্থ নির্ণয়ের সমস্যা যাস্ক-কেও বিব্রত করেছিল। তাঁর 'নিরুক্ত' এর সাক্ষ্য বহন করে । সাম্প্রতিককালে ইরাণীয়, হিত্তি ও অন্যান্য আর্যভাষার সাহায্যে আমরা একটা মোটামুটি সন্তোষজনক অর্থ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছি। বৈদিক ভাষার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ইরাণীয় ভাষার । ইরাণীয় 'আবেস্তা'র অনেক মন্ত্র ধ্বনিপরিবর্তনের সাহায্যে ঋকমন্ত্রে রূপান্তরিত করাও সম্ভবপর হয়েছে ।

যাস্ক ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন-(১) পরোক্ষকৃত, (২) প্রত্যক্ষকৃত, ও (৩) আধ্যাত্মিক । দেবতাকে যেখানে পরোক্ষভাবে স্তুত করা হয়েছে ও ক্রিয়াপদ প্রথম

পুরুষে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলিই হচ্ছে পরোক্ষাকৃত মন্ত্র । আর দেবতাকে যেখানে প্রত্যক্ষভাবে আহ্বান করা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে প্রত্যক্ষাকৃত মন্ত্র । আর যেখানে কোন ঋষি, দেবতার সঙ্গে তদাত্মাপ্রাপ্ত হয়ে উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদের সাহায্যে আত্মস্তুতিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেগুলি আধ্যাত্মিক মন্ত্র। তবে আধ্যাত্মিক মন্ত্রের সংখ্যা খুবই কম। অবশ্য, এর ব্যতিক্রমও আছে । যেমন দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে পুরূরবা ও উর্বশীর কথোপকথন । একে সংবাদ-সূক্ত বলা হয়। অনেক সময় লৌকিক বিষয়বস্তুরও অবতারণা করা হয়েছে । এই শ্রেণীর সূক্তগুলিকে 'অক্ষসূত্র' বলা হয় । আবার কোন কোন জায়গায় গম্ভীর দার্শনিকতত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে ; যেমন নাসদীয় মুক্ত) (১০।১২৯) ও পুরুষসূক্ত (১০।৯০) । আবার, কোন কোন জায়গায় অথর্বন মন্ত্রের ন্যায় শাপ, অভিশাপ ইত্যাদিও দেখা যায় ।

সমস্ত ঋগ্বেদখানা বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতমহল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মন্ত্রগুলি কোন এক বিশেষ সময়ে রচিত হয় নি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও কয়েক শতাব্দী ধরে মন্ত্রগুলি রচিত হয়েছিল । এমন কি ঋগ্বেদের মধ্যে এমন অনেক মন্ত্র আছে, যা আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বকালের রচিত। দেবতামণ্ডলীর গঠন দেখেও তাই মনে হয়। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র বিশদ আলোচনা করেছি, সে কারণে এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করছি না । (লেখকের 'ডিনামিকস্ অভ্ সিনথেসিস ইন হিন্দু কালচার' দেখুন)।

।। তিন ।।

সামবেদের নামকরণ করা হয়েছে ‘সামন’ শব্দ থেকে । ‘সামন’ শব্দের অর্থ হচ্ছে দেবতার স্তুতির উদ্দেশ্যে গান । তার মানে, সামবেদ হচ্ছে গানের সংকলন বা গানের জন্য ব্যবহৃত ঋকমন্ত্রই সাম । এক কথায়, যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যে সকল ঋক উচ্চারিত না হয়ে, গীত হত, তাদের সমষ্টিই হচ্ছে সামবেদ । ঐতরেয়ব্রাহ্মণ অনুযায়ী উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা—এই তিনজন ঋত্বিকে মিলে সামগান করত ।

সামবেদের তেরটি শাখা আছে। তার মধ্যে কৌথুমী শাখাই প্রসিদ্ধ। এটা উত্তরভারতে প্রচলিত। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত শাখার নাম হচ্ছে রানায়নী শাখা ।

।। চার ।।

যজ্ঞের মন্ত্রকে ‘যজুস’ (যজ+উসি) বলা হয়। যে বেদে এরূপ মন্ত্র আছে, তাকে যজুর্বেদ বলা হয়। এরূপ মন্ত্রের উচ্চারণে কোন চরণ বা অবসান থাকত না । সেজন্য যজুর্বেদকে গদ্যগ্রন্থ বলা হয়। যজুর্মন্ত্র অধ্বর্যু নামক ঋত্বিকের দ্বারা অনুঃচ্চস্বরে উচ্চারিত হত ।

যজুর্বেদের দুইভাগ— কৃষ্ণ ও শুক্ল । এই দুইভাগ সম্বন্ধে একটা উপাখ্যান আছে। প্রথমে বেদব্যাস বৈশাম্পয়নকে যজুর্বেদ শিক্ষা দেন । তারপর বৈশাম্পয়ন যাজ্ঞবল্ক্যকে এটা অধ্যায়ন করান । কোন কারণে বৈশাম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের ওপর রুষ্ট হয়ে, তাকে অধীত বিদ্যা ত্যাগ করতে বলেন । যাজ্ঞবল্ক্য বমন করে তার অধীত বিদ্যা ত্যাগ করে । তখন বৈশাম্পয়নের অন্য শিষ্যরা তিত্তিরিপক্ষী হয়ে ওই বমনকৃত যজুর্মন্ত্র ভক্ষণ করে । তাদের

মলিন বুদ্ধির জন্য এই যজুর্মন্ত্র কৃষ্ণ হয়ে যায় । সে জন্য এর নাম কৃষ্ণ যজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা আখ্যা হয়। অনেকে মনে করেন যে শুক্ল যজুর্বেদ কুরু-পঞ্চাল দেশে ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ মিথিলায় প্রচলিত ছিল। সামবেদের ন্যায় যজুর্বেদও যজ্ঞীয় সাহিত্য।

যজুর্বেদের বিভাগগুলি ক্রিয়ামূলক । এর ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞক্রিয়ার মন্ত্র ও বিধান আছে । এই সকল বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে –দর্শযাগ, পিণ্ডাপিতৃযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, রাজসূয়, সৌত্রামনী, অগ্নিচয়ণ, অশ্বমেধ, পুরুরমেধ, সর্বমেধ, ও পিতৃমেধ । যজ্ঞে মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হবার জন্য যে নিয়মগুলি প্রণীত হয়েছিল, তা থেকে 'দেববিদ্যা', 'ব্রহ্মবিদ্যা' ও ব্যাকরণের উৎপত্তি হয় । এবং যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যে চিতি তৈরী করা হত, তার নিয়মগুলি থেকে জ্যামিতি শাস্ত্রের উদ্ভব হয় । শুক্র যজুর্বেদের চতুর্দশ অধ্যায়টি উপনিষদ । একে ঈশা উপনিষদ বলা হয় ।

।। পাঁচ ।।

অথর্ববেদ পরে রচিত হয়েছিল। এর ক্রিয়াকলাপাদি ঋক, সাম ও যজুর্বেদের যজ্ঞক্রিয়াদি থেকে পৃথক । সেজন্য মনে হয় আদিতে ঋক, সাম ও যজু –এই তিন বেদ ছিল । কেননা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৫।৩২)। শতপথব্রাহ্মণ (১।৬।৭।১৩) বৃহদারণ্যক উপনিষদ (১।৫।৫), ও ছান্দোগ্য উপনিষদ (৩।১৭।১) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের অনেক স্থলে মাত্র ঋক, সাম ও যজুবেদের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলিতে ও মনুসংহিতাতেও তিনটি বেদেরই উল্লেখ আছে। সেজন্য ঋক, সাম ও যজুর্বেদকে ত্রয়ী বলা হয় । অথর্ববেদ

পরবর্তী কালের সংযোজন । এতে ঐহিক ফলপ্রদ, শত্রুমারণাদির উপযোগী ক্রিয়াকলাপের মন্ত্রসমূহ আছে। এগুলি সোম যজ্ঞাদিতে অব্যবহার্য । সেজন্যই এর নাম অথর্ব ।

অথর্ববেদ ২০ কাণ্ডে বিভক্ত । এর সুক্ত সংখ্যা প্রথম কাণ্ডে ৩৫, দ্বিতীয় কাণ্ডে ৩৬, তৃতীয় কাণ্ডে ৩১, চতুর্থ কাণ্ডে ৪০, পঞ্চম কাণ্ডে ৩১, ষষ্ঠ কাণ্ডে ১৪২, সপ্তম কাণ্ডে ১১৮, অষ্টম কাণ্ডে ১০, নবম কাণ্ডে ১০, দশম কাণ্ডে ১০, একাদশ কাণ্ডে ১০, দ্বাদশ কাণ্ডে ৫, ত্রয়োদশ কাণ্ডে ৪, চতুর্দশ কাণ্ডে ২, পঞ্চদশ কাণ্ডে ১৮, ষোড়শ কাণ্ডে ৯, সপ্তদশ কাণ্ডে ১, অষ্টাদশ কাণ্ডে ৪, উনবিংশ কাণ্ডে ৭১ ও বিংশ কাণ্ডে ১৪৩, উনবিংশ কাণ্ডটি হচ্ছে অন্যান্য কাণ্ডের পরিশিষ্ট । আর বিংশ কাণ্ডটি ঋগ্বেদ থেকে উদ্ধত সূক্তে পরিপূর্ণ। এই উদ্ধৃতিসমূহ অধিকাংশই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সূক্ত । অথর্ববেদের অধিকাংশ অংশই পদ্য, তবে কিছু অংশ গদ্য আছে ।

।। ছয় ।।

এ পর্যন্ত যে বৈদিক সাহিত্যের কথা বলা হল, তাকে সংহিতা বলা হয় । এ ছাড়া, বেদের আরও তিনটা ভাগ আছে যথা (১) ব্রাহ্মণ, (২) আরণ্যক, ও (২) উপনিষদ । ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির মধ্যে সন্নিবিষ্ট বিষয়বস্তু সমূহ হচ্ছে মন্ত্রের অর্থমীমাংসা, যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ বিবরণ ও নানা বিষয়ক উপাখ্যান। ঋগ্বেদের দুইটা প্রধান ব্রাহ্মণ হচ্ছে- ১) শাঙ্খায়ণ বা কৌষীতকী, ও (২) ঐতরেয় । ব্রাহ্মণের যে অংশ অরণ্যে পাঠ করা হত,

তাকে 'আরণ্যক' বলা হত । শাঙ্খায়ণ বা কৌষীতকী আরণ্যক ১৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়কে কৌষীতকী উপনিষদ বলা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৪০টি অধ্যায় আছে। এর প্রায় সমগ্র অংশই সোমাযজ্ঞের বিবরণে পূর্ণ। শেষের দশটি অধ্যায়কে অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনে করা হয়। এই অংশে ইক্ষাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা আছে । একেবারে শেষের তিনটি অধ্যায়ে কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ আছে, যেমন প্রাচ্যে বিদেহ প্রভৃতি জাতিদিগের সাম্রাজ্য, দক্ষিণে ভোজরাজ্য, পশ্চিমে নীচ্য ও অপাচ্য রাজ্য, ও উত্তরে উত্তর কুরু ও উত্তর মদ্রদিগের রাজ্য ও মধ্যদেশে কুরুপঞ্চালদিগের রাজ্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এ ছাড়া, পরিক্ষীত পুত্র জনমেজয়, মনুপুত্র শার্যার্ত, উগ্রসেন পুত্র যুধাংশ্রেষ্ঠি, বিজবন পুত্র সুদাস, দুষ্মন্ত পুত্র ভরত প্রভৃতি অনেক রাজার নাম আছে ।

সামবেদের দুটি প্রধান ব্রাহ্মণ হচ্ছে তাণ্ড্য ও ষড়বিংশ । আসলে সামবেদীয় (কৌসুমী শাখার) ব্রাহ্মণ ৪০ ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে ২৫ ভাগকে তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ, ৫ ভাগকে ষড়বিংশ, দুইভাগকে মন্ত্রব্রাহ্মণ ও ৮ ভাগকে ছান্দোগ্য উপনিষদ বলা হয় । তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে সোমাযজ্ঞের বিবরণ, ব্রাত্যস্তোমে ব্রাত্যদিগের বিবরণ, নৈমিষারণ্যের যজ্ঞ ও কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। এতে কোশলরাজ পর আত্মার ও বিদেহরাজ নামী সাপ্যের উল্লেখও পাওয়া যায়। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে অনেক প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বিধান ও দুর্দৈব, পীড়া, শস্যনাশ, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিপদখণ্ডণ উপযোগী অনুষ্ঠানের কথা আছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ও ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে যে সকল যজ্ঞের বিবরণ আছে, তাদের শ্রৌতযজ্ঞ বলা হয় । মন্ত্রব্রাহ্মণে গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় গৃহ্যক্রিয়ার বিবরণ পাওয়া যায়

। ছন্দোগ্য উপনিষদে ওঁ শব্দ, উদ্গীথ, সাম ও পরমব্রহ্ম প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায় । এ ছাড়া, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, সত্যকাম জাবাল, শ্বেতকেতু আরুনেয়, অশ্বপতি কৈকেয়, শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক, আরুনি, সনৎকুমার, নারদ প্রভৃতির কথা আছে ।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ বা তৈক্তিরীয় ব্রাহ্মণ তিনভাগে বিভক্ত। এর দশটি অধ্যায় বা প্রপাঠক আছে। তার মধ্যে সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রপাঠককে তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলা হয়, আর শুক্ল যজুর্বেদের বিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণের নাম শতপথব্রাহ্মণ । মাধ্যান্দিন শাখার শতপথব্রাহ্মণ ১৪টি কাণ্ডে ও ১০০টি অধ্যায়ে বিভক্ত । সেজন্যই একে শতপথব্রাহ্মণ বলা হয়। ১৪টি কাণ্ডের মধ্যে নয়টি খুব প্রাচীন । দশমটিতে অগ্নিরহস্য ও একাদশে অগ্নিচয়নের কথা আছে । ত্রয়োদশে অশ্বমেধ ও নরমেধ-এর কথা আছে । এই কাণ্ডে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরত, ভারতদিগের রাজা সাত্রোজিত ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কাশীরাজ ধৃতরাষ্ট্র, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় ও তাঁর ভ্রাতা ভীমসেন, উগ্রসেন ও শ্রুতসেন প্রভৃতি রাজাদের কথা আছে । শতপথব্রাহ্মণের চতুর্দশ কাণ্ডকে আরণ্যক বলা হয়। এরই শেষের ছয় অধ্যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদ। এতে আলোচিত হয়েছে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি, গার্গ্য, বালাকি ও কাশীর রাজা অজাতশত্রুর কথা, বিদেহরাজ জনকের কথা, গার্গ বাচক নবীর কথা, যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর কথা, উদ্যালক আরুণির কথা, ও পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও প্রজাপতি, বেদত্রয় ও গায়ত্রী সম্বন্ধে ।

অথর্ববেদের ব্রাহ্মণের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ । এতে এগারটি অধ্যায় বা প্রপাঠক আছে । শতপথব্রাহ্মণে যে সকল উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে, তা গোপথব্রাহ্মণেও দেখতে পাওয়া যায় ।

আগেই বলেছি যে উপনিষদগুলি হচ্ছে দার্শনিক গ্রন্থ । এগুলি প্রধানত পরমব্রহ্মের আলোচনাতেই পরিপূর্ণ। অথর্ববেদের উপনিষদগুলি নানারূপ সাম্প্রদায়িক বিতর্কে পরিপূর্ণ। উপনিষদগুলির এক সময় সংখ্যা ছিল অনেক । তবে বর্তমানে ১২টি উপনিষদই প্রধান বলে গণ্য হয় । এগুলি হচ্ছে –(১) ঋগ্বেদের কৌষীতকী ও ঐতরেয়, (২) সামবেদের ছন্দোগ্য ও কেন, (৩) কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর, (৪) শুক্ল যজুর্বেদের বৃহদারণ্যক ও ঈশা, ও (৫) অথর্ববেদের প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য ।

।। সাত ।।

আগেই বলেছি যে বেদকে শ্রুতি বলা হয় । তার কারণ বেদ গোড়ায় মুখে মুখে উচ্চারিত হত। পরেকার সাহিত্য সূত্রাকারে রচিত হয়েছিল । সূত্র সমূহের অন্যতম হচ্ছে পাণিনীয় জগৎ বিখ্যাত ব্যাকরণ সূত্র । আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির জন্য রচিত হয়েছিল ধর্ম সূত্রসমূহ।

এই সময় আর্যসভ্যতার বিরুদ্ধে এক অবরোধ গঠন করেন। গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধপ্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্ম ভারতের সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটায়। মোটামুটিভাবে এই বিপ্লব

গুপ্তসম্রাটগণের অভ্যুদয় কাল (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই বিপ্লবের প্রকোপে ব্যয়সাধ্য যজ্ঞের আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানসমূহ ক্রমশ হ্রাস পায় । গুপ্তসম্রাটগণের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু ব্যায়সাপেক্ষ যাগযজ্ঞাদির পরিবর্তে স্বল্পখরচে কৃত পূজাদির প্রবর্তন হয়। এই সময় লৌকিক দেবতাসমূহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাদের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয় পুৰাণসমূহে ।

।। আট ।।

বেদোত্তর যুগের প্রাচীন সাহিত্য হচ্ছে পুরাণসমূহ । পুরাণসমূহে আছে ইতিহাস, কাহিনী, উপকথা ও বিভিন্ন দেবতাদের কথা । যদিও এগুলি বেদোত্তর যুগে রচিত হয়েছিল, তাহলেও এরূপ চিন্তা করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ, অতি প্রাচীনকালের। পুরাভবম্ ইতি পুরাণম্ –এই বচন থেকেও এটা সমর্থিত হয়।

পুরাণগুলি সংখ্যায় বহু । তবে তাদের মধ্যে আঠারটি পুরাণকে মহাপুরাণ বলা হয়। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী এই আঠারটি মহাপুরাণ হচ্ছে – (১) ব্রহ্ম, (২) পদ্ম, (৩) বিষ্ণু, (৪) শিব, (৬) ভাগবত, (৬) নারদ, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) অগ্নি, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত, (১১) লিঙ্গ, (১২) বরাহ, (১) স্কন্দ. (১৪) বামণ, (১৫) কুর্ম, (১৬), মৎস্য, (১৭) গরুড় ও (১৮) ব্রহ্মাণ্ড । উপপুরাণগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে- (১) দেবীভাগবত, (২) কালিকাপুরাণ ও (৩) বিষ্ণুধর্মেত্তিরপুরাণ । মহাপুরাণগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে স্কন্দপুরাণ। এতে

৮১,৮০০ শ্লোক আছে। এটা মহাভারতের চেয়েও বড়। আর উপপুরাণগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ ।

অমরকোষ অনুযায়ী পুরাণগুলি পঞ্চলক্ষণযুক্ত। এই লক্ষণগুলি যথাক্রমে – (১) সর্গ (সৃষ্টি), (২) প্রতিসর্গা (প্রলয়ের পর নবসৃষ্টি), (৩) বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশতালিকা), (৪) মন্বন্তর (চতুর্দশ মনুর শাসন বিবরণ) ও (৫) বংশানুচরিত (রাজগণের বংশাবলী) । তবে ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের লক্ষণ দশটি-যথা (১) সর্গ, (১) বিসর্গ, (৩) বৃত্তি, (৪) রক্ষা, (৫) অন্তর, (৬) বংশ, (৭) বংশানুচরিত, (৮) সংস্থা, (৯) হেতু ও (১০) অপাশ্রয়। মৎস্যপুরাণে একাদশ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে যে প্রাগোক্ত পঞ্চলক্ষণ ছাড়া পুরাণের আরও লক্ষণ হচ্ছে–(৬) ভূবন বিস্তার, (৭) দানধর্মবিধি, (৮) শ্রাদ্ধকল্প, (৯) বর্ণাশ্রম বিভাগ, (১০) ইষ্টাপূর্ত ও (১১) দেবতা প্রতিষ্ঠা ।

সমস্ত পুরাণগুলিকেই বেদব্যাসের রচিত বলা হয়। এদের প্রবক্তা হচ্ছেন লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশবা । উগ্রশবা এর প্রচার করেন নৈমিষারণ্যে ! মহাভারতের ন্যায় পুরাণগুলিকে ‘জয়’ নামে অভিহিত করা হয়।

উনিশ শতকে জীবানন্দ বিদ্যাসাগরই প্রথম পুরাণগুলি মুদ্রিত করেন । পরে বঙ্গবাসী প্রেস বঙ্গানুবাদ সহ পুরাণগুলি প্রকাশ করে। বর্তমানে বোম্বাইয়ের বেঙ্গকটেশ্বর প্রেস ও কলকাতার আর্যশাস্ত্র কার্য্যালয় পুরাণগুলি আবার প্রকাশ করছে ।

সত্ত্ব, তম ও রজাগুণ অনুসারে পুরাণগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয় । বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট পুরাণ । মৎস্য, কুর্ম, লিঙ্গ, স্কন্দ ও অগ্নি তমোগুণ বিশিষ্ট পুরাণ। আর ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বামন রজ গুণ বিশিষ্ট পুরাণ ।

পুরাণগুলির মধ্যে অগ্নিপুরাণে এত প্রকীর্ণ বিষয়ের সমাবেশ আছে যে একে একখানা বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে । এতে আছে প্রতিমালক্ষণ, রত্নপরীক্ষা, মন্দির প্রতিষ্ঠা, বাস্তুণাস্ত্র, হস্তী ও অশ্বাচিকিৎসা আয়ুর্বেদ, নাটক, অভিনয়, রসাদি নিরূপণ, অলঙ্কার, বিচার, ব্যাকরণ ও অভিধান । এতে বিষ্ণু, লিঙ্গ, দুর্গা, গণেশ, সূর্য প্রভৃতি দেবতার পূজা, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান, দেবতার মূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, বিবাহানুষ্ঠান, অন্তেষ্টিপদ্ধতি প্রভৃতির কথা ছাড়া, মৃত্যু ও জন্মান্তরবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব, ভূগোল, বংশানুকীর্তন প্রভৃতি বিশুদ্ধ পৌরাণিক বিষয়েরও বিবরণ আছে । আরও যে সব বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যে আছে জ্যোতিষ শাকুন বিদ্যা, গৃহনির্মাণ, রাজনীতি, যুদ্ধ বিদ্যা, চিকিৎসা, ছন্দ, কাব্য ইত্যাদি । অনুরুপভাবে বিশ্বকোষের সামিল হচ্ছে স্কন্দপুরাণ । আগেই বলেছি যে এতে ৮১৮০ ০ শ্লোক আছে। এতে স্কন্দ বা শড়াননের ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কাশী, আবন্তী, নাগর ও প্রভাস এই সাত খণ্ডে বিভক্ত। এই পুরাণখনি যে অতি আধুনিক পুরাণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কেননা সত্যনারায়ণের ব্রত কথাও এতে আছে।

ব্রহ্মপুরাণকে আদিপুরাণ বলা হয়। তার কারণ হিন্দুর বিশ্বাস এই পুরাণই প্রথম রচিত হয়েছিল। এই পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবতা ও অসুরগণের জন্ম, সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ, বিশ্ববর্ণনা, দ্বীপ ও বর্ষ, স্বর্গ, নরক ও পাতালদির বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণের জীবন চরিত ও যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। আবার অনেকের মতে ব্রহ্মপুরাণ নয়, আদিপুরাণ হচ্ছে বায়ুপুরাণ। বানভট্ট এই আদি পুরানের উল্লেখ করেছেন । গয়াশ্রাদ্ধ ও গয়ামাহাত্ম্য এই পুরাণের অন্তর্গত । বায়ুপুরাণের চারটি পাদ যথা প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপোদখাত ও উপসংহার।

পুরাণসমূহের পঞ্চলক্ষণ বিশুদ্ধভাবে দেখতে পাওয়া যায় বিষ্ণুপুরাণে । সাহেবরা এর ঐতিহাসিক মূল্যও স্বীকার করেছেন । এটা পঞ্চরাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম মূল গ্রন্থ । আচার্য রামানুজও এর প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন । এটা ছয়ভাগে বিভক্ত, যথা (১) বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি, ধ্রুব চরিত্র, প্রহলাদ চরিত্র ইত্যাদি আখ্যান, (২) পৃথিবী, সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র ; (৩) ব্যাস কর্তৃক বেদবিভাগ, শাখা বিভাগ, আশ্রম ধর্ম ইত্যাদি ; (৪) সূর্য ও চন্দ্রবংশ এবং রাজবংশের বর্ণনা , (৫) কৃষ্ণচরিত্র, বৃন্দাবন লীলা, রাসলীলা ইত্যাদি ; (৬) বিষ্ণুভক্তি, যোগ ও মুক্তির কথা ।

অন্যান্য পুরাণে অন্যান্য দেবতার মহাত্ম্য বিবৃত হয়েছে। পদ্মপুরাণ বৈষ্ণবপুরাণ | পদ্মপুরাণে ৫৫,০০০ শ্লোক আছে । পাঁচখণ্ডে এই পুরাণ বিভক্ত, যথা সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড ও উত্তরখণ্ড । এতে যে সব বিষয় বিবৃত হয়েছে, তা হচ্ছে–সৃষ্টির আদিক্রম, তারকাসুরের উপাখ্যান, গো মাহাত্ম্য, বৃত্রবধ, পৃথুচরিত, বেণুরাজার উপাখ্যান,

নহুষ ও যযাতির কাহিনী, ব্রহ্মখণ্ডের উৎপত্তি, কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ বিবরণ, কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্তন, কর্মযোগ নিরুপণ, অগস্ত্যাদি ঋষির আগমন, রাবণোপাখ্যান, জগন্নাথের বিবরণ, কৃষ্ণের নিত্যলীলা কথন, দধীচির উপাখ্যান, শিব মাহাত্ম্য, ব্রতমাহাত্ম্য, নৃসিংহ উৎপত্তি, জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত তীর্থসমূহের মাহাত্মা, ভাগবত মাহাত্ম্য, অবতারাদির বিবরণ ইত্যাদি ।

নারদপুরাণে শিব ও বিষ্ণু মাহাত্ম্য, বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব আচরণ, ও তীর্থপ্রসঙ্গ আছে। ভবিষ্যপুরাণে সূর্য পূজার বিস্তৃত ইতিহাস আছে । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ কৃষ্ণলীলাত্মক । লিঙ্গপুরাণ শৈবপুরাণ। বরাহ বৈষ্ণবপুরাণ। বামুনপুরাণে শিব ও বিষ্ণুর উভয়েরই মাহাত্ম্য বিবৃত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সুপ্রসিদ্ধ দেবীমাহাত্ম্য বা সপ্তশতী চণ্ডীর স্তোত্র আছে । তা ছাড়া, এতে আছে বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্রের কলহ, দুর্গ কথা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থা কথন, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, মদালসার উপাখ্যান, রুদ্রাদি সৃষ্টি, মার্কণ্ডের জন্ম, ইক্ষাকুচরিত, রামচন্দ্রের উপাখ্যান, পুরূরিবার উপাখ্যান ইত্যাদি। গরুড়পুরাণ বৈষ্ণবপুরাণ। কুর্ম ও ব্রহ্মাণ্ড প্রাচীন পুরাণ । মৎস্যপুরাণে সমুদয় পুরাণের একটা অনুক্রমনী দেওয়া আছে। উপপুরাণগুলির মধ্যে দেবীভাগবত শক্তিগণের কাছে মহাপুরাণ হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমান দুর্গাপূজা কালিকাপুরাণ অনুযায়ী হয় । সমুদয় উপপুরাণের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ। এর প্রথম খণ্ডে সৃষ্টি প্রকরণ, বংশ তালিকা ও উপাখ্যানাদির সঙ্গে কাশ্মীর ও গান্ধার দেশের ভৌগলিক বিবরণ আছে । দ্বিতীয় খণ্ডে নীতি ও ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষ, তৃতীয় খণ্ডে ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ, অলঙ্কার, নৃত্যগীত, স্থাপত্য, প্রতিমানির্মাণ ও চিত্রকলার কথা ব্যাখ্যাত আছে ।

স্থানে স্থানে অসংগতি থাকলেও পুরাণগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট ।

দেবলোকের পরিচিতি

গোড়াতেই দেবলোকের একটা পরিচিতি দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। সংক্ষেপে, দেবতারা যেখানে বাস করতেন, সেটাই দেবলোক । পরবর্তীকালে আমরা দেবলোককে 'স্বর্গ' আখ্যা দিয়েছি । কিন্তু হিন্দুর সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থে ঋগ্বেদে দেবতাদের আবাসস্থল হিসাবে 'স্বর্গ'-এর কোন উল্লেখ নেই। বস্তুতঃ যুগে যুগে দেবলোকের অবস্থান ও তার বাসিন্দাদের নামধাম ও চরিত্র পালটে গেছে। ঋগ্বেদের যুগে দেবতাদের বাসস্থান ছিল তিন জায়গায়। পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও দ্যুস্থানে। পৃথিবীর দেবতাদের মধ্যে ছিলেন অগ্নি, সোম, পৃথিবী, অপ্ ও সরস্বতী । অন্তরীক্ষের দেবতাদের মধ্যে ছিলেন ইন্দ্র, পর্জন্য ও রুদ্র, আর দ্যুস্থানের দেবতাদের মধ্যে ছিলেন সূর্য, সবিতা, পুষা, বরুণ, দ্যু, অশ্বিণীদ্বয়, ঊষা, রাত্রি, যম ও বৃহস্পতি । পরবর্তী কালে শিব ও কুবেরের বাসস্থান ছিল কৈলাসে। আর অন্যান্য সব দেবতাদের নিবাস ছিল স্বর্গে। দেবতা ছাড়া, স্বর্গে আরও বিচরণ করত গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, কিন্নর ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে স্বর্গলোকটা আকাশের দিকে বা নভোমণ্ডলের কোন জায়গায় ছিল বলে মনে করা হত। এই কল্পনায় বশীভূত হয়েই জার্মান লেখক এরিখ ফন দানিকেন ও তাঁর অনুগামী ইংরেজ লেখক আর. কে. জি. টেমপাল এক মতবাদ খাড়া করেছেন যে নভোমণ্ডলের অন্য গ্রহ থেকেই দেবতারা মর্ত্যে এসেছিলেন । ওই মতবাদের পিছনে যে কোন যুক্তি নেই, তা আমি ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ নভেম্বর তারিখের 'সানডে' পত্রিকায়

লিখেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন যে 'সিরিয়াস' (Sirius) নামক নক্ষত্র থেকে আফ্রিকার জাতিবিশেষ মর্ত্যে অবতরণ করেছিল । তারই প্রতিবাদে আমি লিখেছিলাম–বস্তুতঃ যতক্ষণ না দানিকেন বা তাঁর অনুগামীরা প্রমাণ করতে পারছেন যে, যে গ্রহ থেকে দেবতারা মর্ত্যলোকে এসেছিলেন সে গ্রহের তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার অন্যান্য লক্ষণ মানুষের প্রাণ ধারণের পক্ষে অনুকুল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের মতবাদের কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। বস্তুতঃ হিন্দুর দেবতাদের যে ভাবে বিবর্তন ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেও দানিকেনের মতবাদ গ্রহণ করা চলে না। ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের দেবতাসমূহ ছিল হয় নৈসর্গিক ঘটনার প্রতীক আর তা নয়তো পার্থিব কোন পদার্থ বা বস্তু-বিশেষ যার দ্বারা আর্যরা উপকৃত হতেন । পরে রূপকের সাহায্যে তাদের মানুষের রূপ ও চারিত্রিক গুণাগুণ দেওয়া হয়েছিল । এরই অতি বিস্তারণ করা হয়েছিল পৌরানিক যুগে নানাবিধ কাহিনীর দ্বারা । তার মানে, তারা অন্য গ্রহ থেকে আসেনি। মর্ত্যলোকের মানুষেরই তারা কল্পনাপ্রসূত। পরের অনুচ্ছেদে আমি হিন্দুর দেবতাদের বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি ।

।। দুই ।।

দেবতাদের সম্বন্ধে নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন- "দেবো দানাদ বা দীপনাদ বা দ্যোতমদ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা ।' তার মানে যিনি দান করেন তিনি দেবতা, যিনি দীপ্ত হন বা দ্যোতিত হন তিনি দেবতা, এবং যিনি দ্যুস্থানে থাকেন তিনিও দেবতা । ঋগ্বেদে যে কোন বিষয়বস্তুকেও দেবতা বলা হয়েছে, যদি তাদের মধ্যে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার

বা বৈষয়িক ঋদ্ধি বৃদ্ধির কোন শক্তির প্রকাশ দেখা যেত । সোমলতাকেও দেবতা বলা হয়েছে, মণ্ডুককেও দেবতা বলা হয়েছে, আবার সরস্বতী নদীকেও দেবতা বলা হয়েছে । তা ছাড়া, ঋগ্বেদের আর্যদের যে সব বড় বড় দেবতা ছিলেন, সে সব দেবতা প্রকৃতির মধ্যে নৈসর্গিক ঘটনারই প্রকাশ মাত্র । বস্তুতঃ ঋগ্বেদের আর্যরা ছিলেন প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপাসক। যে সকল নৈসর্গিক ঘটনা বা পার্থিব বস্তু তাদের বৈষয়িক জীবনচর্যার সহায়ক ছিল, তাঁদেরই তারা দেবতা আখ্যা দিয়েছিলেন । তারপর রূপকের সাহায্যে তাঁদের মনুষ্য আকৃতি দেয়া হয়েছিল। তার মানে মূলতঃ দেবতারা যাই হন না, পরে তাদের মানুষের রূপ ও গুণাগুণ দেওয়া হয়েছিল ।

পরবর্তীকালে হিন্দুরা তেত্রিশ কোটি দেবতার কল্পনা করেছিল। কিন্তু ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছে যে দেবতার সংখ্যা মাত্র ৩৩টি । ঋগ্বেদের সাতটি সূক্তে ৩৩টি দেবতার উল্লেখ আছে, যদিও তারা কোন কোন দেবতা, তা বলা হয়নি। আবার দুটি সূক্তে ৩৩৩৯ দেবতার কথা বলা হয়েছে । পণ্ডিতরা বলেন যে ৩৩ সংখ্যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি এবং দুটি শূন্য দিয়ে, পরে যোগ করে, এই সংখ্যাটি তৈরী করা হয়েছিল, যথা : ৩৩+ ৩০৩ + ৩০০৩ = ৩৩৩৯ । মনে হয় পৌরাণিক যুগে এই সংখ্যাটাকেই বর্দ্ধিত করে তেত্রিশ কোটিতে দাঁড় করানো হয়েছিল। তবে নিরুক্তকার যাস্কের মতে গোড়ায় আর্যদের মাত্র তিনটি দেবতা ছিল । তাঁরা হচ্ছেন অগ্নি পৃথিবীর দেবতা, বায়ু ও ইন্দ্র অন্তরীক্ষের দেবতা ও সূর্য দ্যুলোকের দেবতা ।

ঋগ্বেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ দেবতা । প্রজাপতির ন্যায় ইন্দ্র স্বয়ম্ভু দেবতা নন। ত্বষ্টা তাঁর পিতা, অদিতি তাঁর মাতা । স্বাভাবিকভাবে মায়ের গর্ভদ্বার দিয়ে তিনি নির্গত হন নি। তিনি মায়ের পেট বিদীর্ণ করে, পেটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন । তার অস্ত্র বজ্র। বজ্র তিনি পেয়েছিলেন উশনা বা শুক্রদেবের কাছ থেকে । বেদে অবশ্য শুক্রের নাম নেই | উশনা একবার মহাদেবের পেটের ভিতরে চলে গিয়েছিলেন, তারপর মহাদেবের বীর্যদ্বার (শিশ্নমূখ) দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন বলেই, তাঁর নাম শুক্র ।

যদি সূক্তসংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করা হয়, তা হলে বলতে হবে যে ইন্দ্রই ছিলেন ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদের মোট সূক্তসংখ্যা হচ্ছে ১০১৭। তার মধ্যে ন্যূনাধিক ২৫০ সূক্ত তার উদ্দেশ্যে নিবেদিত । মূলতঃ নৈসর্গিক দেবতা হলেও তিনি মনুষ্যরূপে কল্পিত। তিনি যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ । আর্যদের তিনি রক্ষক। তিনি আর্যদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন । তিনি দুটি হরিৎবর্ণ অশ্বদ্বারা পরিচালিত স্বর্ণরথে আরোহণ করেন । তিনি সোমরস পান করতে ভালবাসেন । ঋগ্বেদের বর্ণনা অনুযায়ী তার প্রধান কৃতিত্ব তিনি বৃত্রকে সংহার করে মেঘ হতে বারিবর্ষণের পথ উন্মুক্ত করেছিলেন, তিনি শত্রুদের দুর্গ সমন্বিত নগরগুলি ধ্বংস করে তাদের বিনাশ সাধন করেছিলেন, এবং বিশ্বস্থিতির জন্য তিনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন ।

ঋগ্বেদে অগ্নির উদ্দেশ্যে প্রায় ২০০ সূক্ত আছে। সুতরাং ইন্দ্রের পরেই অগ্নি আর্যদের দ্বিতীয় প্রধান দেবতা ছিল । যদিও অরণীর সাহায্যে তিনি উৎপন্ন, তা হলেও মনুষ্যরূপে

তিনি কল্পিত । তিনি যজ্ঞের ঋত্বিক, পুরোহিত ও হোতা । অগ্নিই দেবতাদের যজ্ঞে আনয়ন করেন । তাঁর নানারূপ । তিনি কখনও জাতিবেদ্য, কখনও রক্ষোহা, কখনও দ্রবিনোদ, কখনও তমুনপাদ, কখনও নরাশংস, কখনও অপানেপৎ, এবং কখনও মাতরিস্বন । ঘৃত ও কাষ্ঠ তাঁর আহার্য । হব্য তাঁর পানীয় ।

ঋগ্বেদে সূর্যকেও মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হয়েছে । তিনি হরিৎবর্ণের সাতটি বেগবান অশ্ববাহিত রথে চলাফেরা করেন । বিশ্বভুবন এবং সমস্ত প্রাণিবর্গ সূর্যের আশ্রিত । তিনি মনুষ্য ও পশুর রোগ নিরাময় করেন ।

পুষ্য রথিশ্রেষ্ঠ। তিনিই সূর্যের হিরন্ময় রথচক্র পরিচালনা করেন। রাত্রি তাঁর পত্নী । ঊষা তার ভগিনী ।

ঋগ্বেদে আরও অনেক দেবতার উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে বিষ্ণু, যম, বৃহস্পতি ও সোম-এর নাম করা যেতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫ সূক্তে বলা হয়েছে যে, বিষ্ণু তিন পদক্ষেপে সমগ্র ভুবনে অবস্থিতি করেন । বিষ্ণু ঋতুর নিয়ামক দেবতা ।

যম পিতৃলোকের রাজা । দু'টি কুকুর নিয়ে তিনি পিতৃলোকের দ্বারে পাহার দেন । ।

বৃহস্পতি মন্ত্র উৎপাদন করেন। বৃহস্পতি প্রভূত প্রজ্ঞাবান । তিনি শত্রুদের অভিভূত করেন ও তাদের নগরসকল বিদীর্ণ করেন । তার মানে তিনি ইন্দ্রের অনুরূপ আচরণ করেন ।

সোম পার্বত্য অঞ্চলের লতাবিশেষ। সোমলতাকে ধুয়ে, পাথরে পিষে, তার রস বের করে দুধ বা দধির সঙ্গে ব্যবহার করা হত। সোম ইন্দ্রের শক্তিবর্দ্ধন করত। দেবতাদের ও আর্যদের এটা একটা প্রিয় পানীয় ছিল । নবম মণ্ডলের সবকটি সূক্তই সোমের উদ্দেশ্যে রচিত । সপ্তম মণ্ডলের ১০৪ সূক্তে ও দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে সোমকে দ্যুস্থানের দেবতাও বলা হয়েছে ।

ঋগ্বেদের আর একজন বড় দেবতা হচ্ছেন বরুণ । বহুস্থলে মিত্র ও বরুণ একত্রে মিত্রাবারুণ নামে উল্লিখিত হয়েছেন । মিত্র ছিলেন আলোকের দেবতা, আর বরুণ আবরণকারী দেবতা । আর্যরা আকাশকে সমুদ্রের সঙ্গে কল্পনা করে জলময় মনে করতেন । এইজন্য ঋগ্বেদে আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখাতে বরুণের অবস্থিতি কল্পনা করা । হয়েছে। বরুণ সূর্যের গমনের পথ বিস্তার করেন । ইনি বৃষ্টির দ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে আদ্র করেন। এক কথায় বরুণ জলের দেবতা ।

।। তিন ।।

বৈদিক দেবতামণ্ডলী পশ্চাদপটে হটে যান পৌরাণিক যুগে । লোকে আর ইন্দ্রকে প্রধান দেবতা হিসাবে পূজা করে না । পৌরাণিক যুগের তিন প্রধান দেবতা হচ্ছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর। ইন্দ্র এই তিন শক্তির অধীন, তিনি অপর দেবতাদের ওপর কর্তৃত্ব করেন বলে, পৌরাণিক কাহিনী সমূহে তাকে দেবরাজ বলা হয়েছে। তাছাড়া, বৈদিক দেবতাদের নিয়ে পৌরাণিক যুগে বহু কাহিনী রচিত হয়েছিল।

পৌরাণিক যুগের তিন দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা হচ্ছেন স্রষ্টা, বৈদিক যুগের হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির সামিল। বিষ্ণু হচ্ছেন রক্ষক, আর শিব সংহারকার্তা ।

পৃথিবীতে একবার মহাপ্রলয় ঘটেছিল। ওই মহাপ্রলয়ের শেষে জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন বিরাট মহাপুরুষ পরম ব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলে তিনি সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করেন। ওই বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হয়। অণ্ড মধ্যে ওই বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা রূপে অবস্থান করতে থাকেন। তারপর ওই অণ্ড দুভাগে বিভক্ত হলে, একভাগ আকাশে ও অপর ভাগ পৃথিবীতে পরিণত হয়। এরপর ব্রহ্মা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ট, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ, এই দশজন প্রজাপতিকে মন থেকে উৎপন্ন করেন । এই সকল প্রজাপতি থেকে সকল প্রাণীর উদ্ভব হয় ।

ব্রহ্মা চতুর্ভূজ, চতুরানন ও রক্তবর্ণ। হংস তার বাহন। সরস্বতী তাঁর স্ত্রী । দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তাঁর দুই কন্যা ।

শ্রীমদ্ভাগবত অনুযায়ী পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে বিষ্ণু শুক্রের ও তাঁর স্ত্রী বৈকুণ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তার স্ত্রী লক্ষ্মীর ইচ্ছায় তিনি তাঁর নিবাস বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ করেন। পৌরাণিক যুগে বিষ্ণুর অবতারবাদের সৃষ্টি হয়। এই অবতারবাদের সাহায্যে তিনি রাম ও কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন হন। গরুড় বিষ্ণুর বাহন।

শিব অনার্য দেবতা। তার প্রতিরূপ আমরা প্রাকবৈদিক সিন্ধু সভ্যতায় পাই । পৌরাণিক যুগে তিনি বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান । তিনি সংহারকর্তা, সেজন্য তাঁকে মহাকাল বলা হয় । তবে সংহারের পর তিনি নূতন করে আবার জীব সৃষ্টি করেন। সেজন্য তিনি লিঙ্গরূপে পূজিত হন। তিনি প্রথমে দক্ষ রাজার কন্যা সতীকে বিবাহ করেছিলেন, পরে হিমালয় রাজার কন্যা হৈমবতী বা পার্বতীকে । তাঁদের পুত্র কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি । তাদের অপর পুত্র গণেশ ও কন্যাদ্বয় লক্ষ্মী ও সরস্বতী । বৃষভ শিবের বাহন, নন্দী ও ভৃঙ্গী তার দুই অনুচর। কুবের তার ধনরক্ষক। কৈলাস তাঁর নিবাস ।

পৌরাণিক যুগের দেবতামণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য স্ত্রী দেবতাগণের প্রাধান্য । বৈদিক দেবতাগণের স্ত্রী ছিল বটে, কিন্তু দেবতামণ্ডলীতে তাদের কোন আধিপত্য ছিল না । কিন্তু পৌরাণিক যুগে স্ত্রী দেবতাগণই হন পুরুষদেবতাগণের শক্তির উৎস। শিবজায়া দুর্গা এগিয়ে আসেন ‘দেবী’ হিসাবে দেবতা মণ্ডলীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে। তাঁর আঁচল ধরে আসেন

অনার্য সমাজের সেই সমস্ত স্ত্রী দেবতা (যথা শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী ইত্যাদি) যাঁরা আগে লুকিয়ে ছিলেন গাছপালায়, ঝোপজঙ্গলে ও পর্বত-কন্দরে ।

।। চার ।।

এবার আমাদের আলোচনা করা যাক দেবতাদের নিবাসস্থল সম্বন্ধে। তার মানে স্বর্গ বা দেবলোক কোথায় ছিল । আগেই বলেছি যে ঋগ্বেদে 'স্বর্গ''-এর কোন কথা নেই। পুরাণেই স্বর্গের কথা আছে, এবং সেটাকেই দেবতাদের নিবাসস্থল বলা হয়েছে । কিন্তু এ স্বর্গটা কোথায় ? স্বাগটা আকাশের দিকে, না পৃথিবীতে ? স্বর্গ সম্বন্ধে পুরাণ থেকে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, সে গুলিই আমি প্রথম এখানে স্থাপন করছি। পুরাণ মতে সুমেরু পর্বতে বিশ্বদেব ও মরুদগণ বাস করতেন । এর শিখরেই ছিল বরুণালয় । ইন্দ্রের আলয় ও রাজধানী অমরাবতীও অবস্থিত ছিল সুমেরু পর্বতে । আমরাবতীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ছিল অলকানন্দ নদী । সুতরাং সুমেরু পর্বত ও অলকানন্দার অবস্থান যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি, তা হলে দেবতাদের বাসভূমি দেবলোকের আমরা হদিশ পাব।

বদরিকাশ্রমের পর যে পার্বত্য ভূভাগ অবস্থিত, তাকে বলা হত হৈমবতবর্ষ । বদরিকাশ্রমের ঠিক পরেই যে পর্বতশ্রেণী ছিল, তার নাম পুরাণে নৈষধ পর্বত। এর পশ্চিমাংশে ছিল হেমকূট পর্বতশ্রেণী, আর উত্তরে ক্রমান্বয়ে গন্ধমাদন (মন্দর), সুমেরু এবং সর্বশেষ নীল পর্বত । হেমকূট পর্বতশ্রেণীর পরেই ছিল কৈলাস পর্বত, তারপর

মৈনাক পর্বত । এর পররর্তী অঞ্চলে দুটি সমৃদ্ধশালী দেশ ছিল—একটি কেতুমাল ও অপরটি উত্তরকুরু। এই অঞ্চলকে বলা হত হরিবর্ষ। সুমেরু পর্বতের পাশে ছিল ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্ব এবং উত্তর কুরু । কেদারনাথ তীর্থ তিনদিকে সুমেরু পর্বতদ্বারা বেষ্টিত ছিল।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তিব্বত দেশের উত্তর ও চীন দেশের পশ্চিমস্থ পর্বতশ্রেণীকেই সুমেরু পর্বত বলা হত । অলকানন্দা গঙ্গোত্রীর কাছে গঙ্গার চারধারার মধ্যে একটি । অমরাবতীর মধ্য দিয়েই অলকানন্দ প্রবাহিত হত, এবং এর দক্ষিণ তীরেই বদ্রিনাথ তীর্থ অবস্থিত। গঙ্গোত্রীর ভৌগলিক অবস্থান হচ্ছে ৩০°৫৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৮°৫৯ উত্তর-পূর্ব দ্রাঘিমায়। এর উচ্চতা ৩৪৪১ মিটার। বদ্রিনাথ অঞ্চলের চৌখাম্বা (উচ্চতা ৭,৬৪৬ মিটার) শিখর হতে উদ্ভূত গঙ্গোত্রী হিমবাহের উত্তর পশ্চিমে যে স্থান হতে পূর্ব হিমবাহ গলে গঙ্গা নদীরূপে প্রকাশিত হত, সেই স্থানটিই গঙ্গোত্রী নামে খ্যাত । এখান হতেই গঙ্গার অপর উৎসমুখ অলকানন্দ প্রবাহিত । ইহা ভারতের অন্যতম দীর্ঘ হিমবাহ। এই হিমবাহের নিকটেই কেদারনাথ শৃঙ্গ (উচ্চতা ৬৯৪০ মিটার) ও এর বামদিকে শিবলিঙ্গ পর্বতমালা । কেদারনাথ তীর্থ (উচ্চতা ৩,৫২৫ মিটার) চামোলি জেলার উখিমঠ মহকুমায় অবস্থিত। হৃষীকেশ হতে বাসে ১৭৯ কিলোমিটার নেমে কুণ্ডচটি। সেখান থেকে হাঁটাপথে ৫১ কিলোমিটার দূরে ত্রিযুগীনারায়ণ । ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে কেদারনাথ তীর্থে যেতে হয়।

কৈলাস পর্বত মহাদেব ও কুবেরের বাসস্থান। কৈলাসের উচ্চতা ৬৭১৪ মিটার। লিঙ্গাকৃতি এই শিখরটি দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতে, লাসা হতে কাংরিম পোচে । মহাভারতে (৬।৭।৩৯) কৈলাসকে হেমকুট বলা হয়েছে। কৈলাসের ২৬ কিলোমিটার দক্ষিণে মানসসরোবর। এই মানস সরোবরের উত্তর তীরস্থ পর্বতেই ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রের একশত বৎসর ধরে যুদ্ধ চলেছিল।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতেই আমি কতগুলো জায়গার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা দিচ্ছি। এ থেকেই দেবলোকের ও কৈলাসের অবস্থান বুঝতে পারা যাবে।

কেদারনাথ ৩০°৪৪’ উত্তর অক্ষাংশ ৭৯°৬৩ পূর্ব দ্রাঘিমা ।
গঙ্গোত্রী ৩০°৫৬ উত্তর অক্ষাংশ ৭৯°০২ পূর্ব দ্রাঘিমা ।
বদ্রিনাথ ৩০°০০ উত্তর অক্ষাংশ ৭৯°৩০ পূর্ব দ্রাঘিমা ।
মানস সরোবর ২৬°১৩ উত্তর অক্ষাংশ ৯০°৩৮ পূর্ব দ্রাঘিমা ।
মানস সরোবরের ২৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কৈলাস ।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দেবলোক বা স্বর্গ অন্তরীক্ষে কোন জায়গায় নয়। ইহজগতে হিমালয়ের উত্তরাংশে । এটা অন্য কয়েকটি কাহিনীর দ্বারাও সমর্থিত। মহাভারতের মহাপ্রস্থনিক পর্ব অনুযায়ী যুধিষ্ঠির হিমালয়েরই অপর প্রান্তে অবস্থিত ‘স্বর্গে’ গিয়েছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মনসামঙ্গল কাব্যসমূহ অনুযায়ীও বেহুলা তার মৃত স্বামীকে বাঁচাবার জন্য নদীপথে গিয়ে নেতা ধোবানীর সাহায্যে স্বর্গে গিয়েছিল । সুতরাং এই

কাহিনী অনুযায়ী স্বর্গ ইহলোকেরই কোন জায়গায় অবস্থিত ছিল, নদীপথে যেখানে যাওয়া যেত। তা ছাড়া, স্বর্গের অপ্সরারা উত্তর ভারতে হিমালয়ের সানুদেশের কোন না কোন সরোবরে প্রায়ই স্নান করতে আসত । পুরুরবা যখন উর্বশীর সন্ধানে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তিনি কুরুক্ষেত্রের কাছে চারজন অপ্সরার সঙ্গে উর্বশীকে স্নান করতে দেখেছিলেন ।

পৌরানিক উপাখ্যান

পুরাণসমূহের পঞ্চলক্ষণের মধ্যে এক লক্ষণ হচ্ছে সর্গ । সর্গ মানে সৃষ্টি । সব পুরাণেই সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা অনুযায়ী ব্রহ্মা প্রথমে সনৎকুমার, সনন্দ, সনক, সনাতন ও বিভু, এই পাঁচ ঋষিগণকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাঁরা ঊর্ধ্বরেতা থাকায় প্রজাসৃষ্টি হল না। তখন ব্রহ্মা নিজেকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। তাঁর এক অংশ পুরুষ ও অপর অংশ স্ত্রী হল। তিনি পুরুষের নাম দিলেন মনু, আর স্ত্রীর নাম দিলেন শতরূপা । তারা পরস্পর বিবাহিত হয়ে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করল–'পিতঃ কোন কর্মের দ্বারা আমরা আপনার যথোচিত সেবা করব ?' ব্রহ্মা বললেন–'তোমরা মৈথন কর্মদ্বারা প্রজা উৎপাদন কর । তাতেই আমার তুষ্টি।' তখন থেকে মৈথন কর্মের প্রবর্তন হল ।

মনু ও শতরূপার কন্যা প্রসূতি, প্রজাপতি দক্ষের ভার্যা হন । দক্ষ ও প্রসূতির সতী নামে এক কন্যা হয় । দক্ষ শিবের সঙ্গে তার বিবাহ দেন । কিন্তু শিব কোনদিন তাকে যথোচিত সম্মান দেখাতে পারেন নি মনে করে, দক্ষ শিবের ওপর খুব বিরূপ হন। দক্ষ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সকলকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু শিব ও সতীকে নিমন্ত্রণ করেন না । সতী এই যজ্ঞে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েন । শিব বাধা দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সতী পিতৃগৃহে যান। সেখানে যজ্ঞস্থলে পিতার মুখে শিবনিন্দা শুনে, সতী পিতার সম্মুখেই দেহত্যাগ করেন। শিব খবর পেয়ে তার অনুচরদের নিয়ে যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হন । দক্ষযজ্ঞ তিনি পণ্ড করে দেন ও দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করে। দক্ষপিতা ব্রহ্মার

অনুরোধে শিব দক্ষকে প্রাণদান করেন বটে, কিন্তু তার নিজ মুণ্ডের বদলে ছাগমুণ্ড দেন। তারপর শিব সতীর শোকে কাতর হয়ে, সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয় নাচন শুরু করেন । সৃষ্টি ধ্বংস হবার উপক্রম দেখে, বিষ্ণু নিজ চক্রদ্বারা সতীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে দেন। যে যে জায়গায় সতীর দেহাংশ পড়ে, পরবর্তীকালে তা মহাপীঠ নামে খ্যাত হয় । এই ভাবে একান্ন মহাপীঠের উৎপত্তি হয় ।

মনুর উল্লেখ আগেই করেছি। ব্রহ্মার দেহ থেকে উদ্ভূত বলে এর নাম স্বয়ম্ভুব মনু । শতরূপার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। এদেরই পুত্রকন্যা থেকে মানব জাতির বিস্তার হয় । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-এই চার যুগে চতুর্দশ মনু জন্মগ্রহণ করেন। এক এক মনুর অধিকার কালকে 'মন্বন্তর' বলা হয় । এক মন্বন্তর শেষ হলে, দেবতা ও মনুপুত্ররা বিলুপ্ত হন । আবার নূতন দেবতা ও মানুষের সৃষ্টি হয় ।

।। দুই ॥

দক্ষ রাজার অন্যতম কন্যা অদিতি হতে কশ্যপের ঔরসে বিবস্বানের জন্ম হয়। স্ত্রী সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের বৈবস্বত মনু নামে এক পুত্র হয় । বৈবস্বত মনু বদরিকাশ্রমে তপস্যা শুরু করেন। একদিন এক ক্ষুদ্র মৎস্য এসে বৈবস্বত মনুকে বলে 'আপনি আমাকে বলবান মৎস্যদের হাত থেকে রক্ষা করুন । মনু তাকে এক জালার মধ্যে রাখেন । মাছটি বড় হলে তাকে এক পুষ্করিণীতে রাখেন। তারপর আরও বড় হলে নদীতে ছেড়ে দেন । নদীতেও তার স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, তাকে সমুদ্রে স্থান দেন।

একদিন এই মৎস্য মনুকে বলে–'এখন প্রলয়কাল আসন্ন, সবই জলে ডুবে যাবে। আপনি শক্ত রজ্জুযুক্ত একখানা নৌকায় সপ্তর্ষিদের নিয়ে বসুন। আমি শৃঙ্গদ্বারা আপনাকে পর্বতশৃঙ্গে নিয়ে যাব।' এইভাবে মনু ও বেদদ্রষ্টা ঋষিরা রক্ষা পান। প্লাবনের পর মানুষের পালনীয় আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কলাপের যথাকর্তব্য নির্ধারণ করে, মনু একখানা সংহিতা প্রণয়ণ করেন । সেটাই হচ্ছে মনুসংহিতা ।

পৃথিবীতে দুই রাজবংশ সৃষ্টি হয়—চন্দ্রবংশ ও সূর্যবংশ । চন্দ্রবংশের দুই শাখা–পুরুবংশ ও যদুবংশ । পুরুবংশের এক বিখ্যাত রাজা হচ্ছেন দুষ্মন্ত । একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে শ্রান্ত হয়ে তিনি মালিনী নদীর তীরে কন্বমুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন । সেখানে কন্বমুনির পালিত কন্যা শকুন্তলার সঙ্গে তার প্রণয় হয়। গন্ধর্বমতে তিনি শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। তঁদের এক বলশালী পুত্র হয়। এই পুত্রের নাম ভরত। ভারতের নাম থেকেই আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের এক অংশ। জম্বুদ্বীপ পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের অন্যতম। বাকী ছয়টি দ্বীপ হচ্ছে-প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, শাক ও পুষ্কর।

।। তিন ।।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে আছে । বৈদিক সাহিত্যে আরও আছে পুরূরবা ও উর্বশীর কথা । শতপথব্রাহ্মণ অনুযায়ী একবার চন্দ্র বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করে নিয়ে যায়। তারার গর্ভে চন্দ্রের এক পুত্র হয়। এই পুত্রের নাম বুধ । বুধের

সঙ্গে ইলার বিবাহ হয়। ইলার গর্ভে বুধের পুরূরবা নামে এক পুত্র হয়। একবার ইন্দ্রসভায় রাজা পুন্ধর বা আহুত হন। সেখানে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে উর্বশী নাচতে নাচতে তার দিকে তাকায় । এতে উর্বশীর তালভঙ্গ হয় । ফলে, ইন্দ্রের শাপে উর্বশীকে মর্ত্যে এসে বাস করতে হয় । মর্ত্যে কয়েকটি শর্তে উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার মিলন হয়। শর্তগুলি হচ্ছে(১) উর্বশীর সামনে পুরস্কারবা কোনদিন বিবস্ত্র হবেন না, (২) পুরূরবা দিনে তিনবার উর্বশীকে আলিঙ্গন করতে পারবেন। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সঙ্গম করতে পারবেন না, ও (৩) উর্বশী বিছানায় দুটি মেষ নিয়ে শয়ন করবে এবং কেউ ওই মেষ হরণ করতে পারবে না । এইভাবে উর্বশী ও পুরূরবা বহুবৎসর পরম সুখে বসবাস করে। এদিকে স্বগের গন্ধর্বোরা উর্বশীকে স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় । একদিন বিশ্ববসু নামে এক গন্ধর্ব উর্বশীর মেষ দুটি হরণ করে । উর্বশী কেঁদে উঠলে, পুরূরবা বিবস্ত্র অবস্থাতেই মেষ দুটি উদ্ধারের জন্য বিশ্ববসুর পিছনে ছুটে যান। সেই সময় আকস্মিক বজ্রপাতের বিদ্যুতালোকে উর্বশী পুরূরিবাকে বিবস্ত্র দেখে তাকে ত্যাগ করে চলে যান । পুরূরবা উর্বশীর সন্ধানে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান। একদিন কুরুক্ষেত্রের কাছে চারজন অপসারীর সঙ্গে উর্বশীকে স্নানরতা দেখে, তাকে ফিরে যাবার জন্য কান্নাকাটি করেন । অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর উর্বশী এক শর্তে রাজী হন । প্রতি বৎসর মাত্র একদিন এসে তিনি পুরূরবার সঙ্গে মিলিত হবেন, এবং তাতেই তঁদের পুত্রসন্তান হবে। এইভাবে মিলিত হয়ে তাঁদের পাঁচটি সন্তান হয়। তারপর উর্বশী পুরূরবাকে জানান যে স্বগের গন্ধর্বরা তাকে যে কোন বর দিতে প্রস্তুত । পুরূরবা উর্বশীর সঙ্গে চিরজীবন যাপন করতে চান । গন্ধর্বরা পুন্ধরবাকে গন্ধর্বলোকে স্থান দেয়। এইভাবে পুন্ধর বা উর্বশীর চিরসঙ্গী হয়ে থাকেন।

।। চাের ।।

এবার আর এক বৈদিক কাহিনী বলব । সত্যকাম ও জবালার কাহিনী। এই কাহিনী ছন্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকে আছে। একদিন সত্যকাম বিদ্যার্থী হয়ে গৌতম ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হয় । গৌতম তার পিতার নাম ও গোত্র জানতে চান । সত্যকাম বলে— ‘আমি জানি না, তবে মার কাছ থেকে জেনে আসি ।’ মা জবালা যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন। সেই সময় তাঁর গর্ভে সত্যকামের জন্ম হয় । সেজন্য তিনিও সত্যকামের পিতার নাম জানেন না । সত্যকাম মার কাছে এসে প্রশ্ন করলে, মা বলেন– ‘তোমার পিতার নাম আমি জানি না । তুমি মহর্ষিকে বল, আমি জবালার পুত্র।’ সত্যকাম ফিরে এসে গৌতমকে সেই কথা বলে। তার সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হয়ে গৌতম তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে। গৌতম বলেন– ‘ব্রাহ্মণ, তুমি সত্য হতে ভ্রষ্ট হও নি। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কারুর পক্ষে এরূপ সত্যাচারণ কখনও সম্ভব নয় ।’

।। পাঁচ ।।

শ্বেতকেতুর কাহিনী আছে মহাভারতের আদিপর্বে । একদিন শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালকের কাছে বসে থাকার সময় একজন ব্রাহ্মণ এসে তার মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হয় । এই দেখে শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হয় । কিন্তু উদালক তাকে ক্রোধ নিবারণ করতে বলেন,–এই বলে ‘স্ত্রীলোকেরা গাভীদের মত স্বাধীন। সহস্র পুরুষে

আসক্ত হলেও তাদের অধর্ম হয় না। ইহাই সনাতন ধর্ম।' সেই থেকে শ্বেতকেতু মনুষ্য সমাজে বিবাহ প্রথার প্রচলন করে এবং বলে যে, স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষে উপগত হবে, সে মহাপাপে লিপ্ত হবে ।

মহাভারতের বনপর্বে রাজর্ষি শিবির কাহিনী আছে । একদিন এক ব্রাহ্মণ শিবির কাছে এসে বললেন, 'আমি অন্নপ্রার্থী', তোমার পুত্র বৃহদগর্ভকে বধ কর, তার মাংস, আর অন্ন পাক করে আমার প্রতীক্ষায় থাক ।' শিবি তার পুত্রের পক্কমাংস একটি পাত্রে রেখে তা মাথায় নিয়ে ব্রাহ্মণের খোঁজ করতে লাগলেন। একজন তাকে বলল, 'ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার গৃহ, কোষাগার, আয়ুধাগার, অন্তপুর, অশ্বশালা, হস্তিশালা দগ্ধ করছেন।' শিবি আবিকৃতমুখে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভগবন, আপনার অন্ন প্রস্তুত হয়েছে, ভোজন করুণ ।' ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে অধোমুখ হয়ে রইলেন । শিবি আবার অনুরোধ করলে ব্রাহ্মণ বললেন, 'তুমিই খাও।' শিবি অব্যাকুলচিত্তে ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পালন করতে উদ্যত হলেন । ব্রাহ্মণ তখন তাঁর হাত ধরে বললেন, 'তুমি জিতক্রোধ, ব্রাহ্মণের জন্য তুমি সবই ত্যাগ করতে পার।' শিবি দেখলেন, দেবকুমারতুল্য পুতগন্ধান্বিত অলঙ্কারধারী তাঁর পুত্র সম্মুখে রয়েছে। ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হলেন । তিনি স্বয়ং বিধাতা, রাজর্ষি শিবিকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন ।

।। ছয়।।

সমুদ্রমন্থনের উপাখ্যান রামায়ণের বালকাণ্ডে, মহাভারতের আদিকাণ্ডে ও পুরাণসমূহে আছে । তবে বিভিন্ন গ্রন্থে কাহিনীটির কিছু তারতম্য আছে। রামায়ণ অনুযায়ী অমৃত পান করে অজয়, অমর ও নিরাময় হবার উদ্দেশ্যে অসুর ও দেবতারা সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হয়। তারা মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে মন্থন রাজ্জু করে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করতে থাকে। প্রথমে বাসুকী বিষ বমন করে । দেবতারা ভীত হয়ে শিবের কাছে ছুটে যায়। শিব ওই বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হন । আবার মন্থন আরম্ভ করলে মন্দর পর্বত পাতালে প্রবেশ করে । তখন বিষ্ণু কুর্মরূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করে সাগরতলে শয়ন করেন । হাজার বছর মন্থনের পর ধন্বন্তরির আবির্ভাব হয় । তারপর ওঠে অসংখ্য অপ্সরাগণ ও বরুণের মেয়ে বারুণী বা সুরা । এরপর ওঠে উচ্চৈশ্রবা অশ্ব, ও কৌস্তভমনি। সবশেষে ওঠে অমৃত । অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবাসুরে ঘোর সংগ্রাম হলো, বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করে, ওই অমৃত হরণ করেন । বহু বৎসর যুদ্ধের পর দেবতারা জয়ী হন ও ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিকারী হন ।

মহাভারত অনুযায়ী ব্রহ্মার আদেশে দেবতা ও অসুরগণ সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন । সমুদ্র থেকে ক্রমান্বয়ে চন্দ্রদেব ও ঘৃত হস্তে লক্ষ্মী, সুরাদেবী, উচ্চৈশ্রবা ও কৌস্তভমনি ওঠে। সবশেষে অমৃতভাণ্ড হাতে ধন্বন্তরি ও পরে গজরাজ ঐরাবত ওঠে। কৌস্তভমনি নারায়ণ এবং উচ্চৈশ্রবা ও ঐরাবত ইন্দ্র গ্রহণ করেন। এর পরে ওঠে কালকূট বিষ । মহাদেব তা পান করে নীলকণ্ঠ হন । অমৃত ও লক্ষ্মীর অধিকার নিয়ে দেবাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয় । নারায়ণ মোহিনীরূপ ধারণ করে, অসুরদের মোহিত করেন । তারপর দেবগণ নারায়ণের হাত থেকে ওই অমৃত গ্রহণ করে পান করে । এই সময় রাহু নামে এক

দানব দেবতার ছদ্মবেশে অমৃতের কিছু অংশ পান করে। কিন্তু সে গলাধঃকরণ করবার আগেই নারায়ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা তার কণ্ঠচ্ছেদ করেন ।

যদিও বায়ু ও মৎস্য পুরাণে সমুদ্রমন্থনের উপাখ্যানটা অনুরূপ কাঠামোর ভিত্তিতে রচিত, তা হলেও কোন কোন পুরাণ অনুযায়ী পৃথুরাজার উপদেশে ধরীত্রীকে গাভীরূপ করে, তা থেকে অমৃত উৎপন্ন করে । তারপর দুর্বাসার অভিশাপে ওই অমৃত সমুদ্রগর্ভে পতিত হয় । দেবতারা তখন বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়। তখন বিষ্ণু নিজে কুর্মরূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করলে দেবতারা বাসুকীকে মন্থনরজ্জুরূপে ব্যবহার করে সমুদ্রমন্থন করে অমৃত উদ্ধার করে ।

।। সাত ॥

আগের অনুচ্ছেদে পৃথু রাজার উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথু বেণ রাজার পুত্র । বেদে পৃথুর উল্লেখ আছে, বেণ অত্যন্ত প্রজাপীড়ক রাজা ছিলেন । তাঁর শাসনকালে একের স্ত্রীতে অপরের উপগমন—এই পশুধর্ম প্রচলিত হয়। নিজে পুণ্যহীন হলেও পুত্র পৃথুর পুণ্যের কল্যাণে তাঁর স্বর্গ লাভ ঘটে। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতারা পৃথুকে পৃথিবীর অধিপতি করেন। বেণের আমলে পৃথিবী খাদ্যশস্য ইত্যাদি দ্রব্য থেকে প্রজাবর্গকে বঞ্চিত করছিলেন। পৃথ, শরের সাহায্যে পৃথিবীকে আক্রমণ করে । পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করে পালিয়ে যায়। পৃথ, তার পশ্চাদ্ধাবন করে। পলায়নে সক্ষম না হয়ে, পৃথিবী পৃথুর শরণাপন্ন হয় । তখন পৃথ, পৃথিবীকে বলেন- ‘তুমি আমার কন্যা হও, ও প্রজাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর।’

পৃথিবী বলে যে এর জন্য তাকে দোহন করতে হবে, কিন্তু বৎস না হলে তার দুগ্ধ নিসৃত হবে না । অতঃপর স্বয়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করে, পৃথ, স্বহস্তে গো-রূপ পৃথিবীকে দোহন করে। এই দোহনের ফলে, প্রজার অন্নলাভ করে আজও জীবনধারণ করছে। মহাভারত অনুযায়ী পৃথু, পৃথিবীকে দোহন করে সপ্তদশ প্রকার শস্য উৎপাদন করেন। পৃথুর কন্যা বলেই পৃথিবী নামের উৎপত্তি ।

।। আট ।।

পুরূরবা ও উর্বশীর কথা আগেই বলেছি। এঁদের এক পুত্রের নাম আয়ু। আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের ছয় পুত্র, জ্যেষ্ঠ যযাতি নামে প্রসিদ্ধ। যযাতির কথা পরে বলছি । আগে নহুষের কথা বলে নিই। নহুষের কথা মহাভারতের আদি, বন ও শান্তিপর্বে ও পদ্মপুরাণে আছে। নাহুষ অতি পুণ্যবান ও বীর্যবান রাজা ছিলেন। সাধনা দ্বারা তিনি আত্মসংযম অভ্যাস করেছিলেন । ভোগবিলাসে নিরাসক্ত হয়ে, তিনি নিজেকে পুণ্যকর্মে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন যে একবার ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা ও মিথ্যাচারে বৃত্রাসুরকে বধ করে যখন জল মধ্যে আত্মগোপন করেন, তখন দেবতা ও মহর্ষিরা নহুষকে দেবরাজ করেন । ইন্দ্রত্ব পেয়ে নহুষ অত্যন্ত কামপরায়ণ ও অত্যাচারী হয়ে ওঠেন । সেজন্য মহর্ষিরা তাকে আসনচ্যুত করবার পরিকল্পনা করেন । একদিন মহর্ষিরা যখন নহুষকে শিবিকায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একসময় তাঁরা শ্রান্ত হয়ে নহুষকে প্রশ্ন করেন, 'বিজয়িশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম যে গোপ্রন (যজ্ঞে গোবধ) সম্বন্ধে বলেছেন, তা তুমি প্রামাণিক মনে কর কী না ?' নহুষ মোহ বশে উত্তর দেন, 'না, ওই মন্ত্র প্রামাণিক নয়।' ঋষিরা বলেন, 'তুমি অধর্মে

নিরত, তাই ধর্ম বোঝ না । প্রাচীন মহর্ষিগণ ওই মন্ত্র প্রামাণিক মনে করেন, আমরাও করি ।' গোবধ অস্বীকার করার দরুণ নহুষ অভিশপ্ত হয়ে ভূতলে পতিত হন। অপর এক কাহিনী অনুযায়ী ইন্দ্রত্ব পাবার পর নহুষ ইন্দ্রের স্ত্রী শচীকে স্ত্রীরূপে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। শচী নহুষকে বলে যে ঋষিবাহিত শিবিকায় যদি নহুষ তাঁর কাছে আসেন, তবেই তিনি নহুষের অনুগামিনী হবেন । শিবিকায় যাবার সময় নহুষ ঋষিদের সঙ্গে মন্ত্র সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক ও বিবাদ করতে থাকেন । ওই সময় অগস্ত্য ঋষির মাথায় তাঁর পা ঠেকে । এর ফলে অগস্ত্যের শাপে নহুষ সর্পরূপে বিশাখবনে পতিত হন । নহুষের করুণ প্রার্থনায় অগস্ত্য বলেন যে একদিন যুধিষ্ঠির তঁকে শাপমুক্ত করবেন।

।। নয় ।।

নহুষের ছেলে যযাতির দুই বিয়ে। এক স্ত্রী দেবযানী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের মেয়ে, আর অপর স্ত্রী শর্মিষ্ঠা দৈত্যরাজ বৃষপর্বার মেয়ে । তার মানে ক্ষত্রিয় হয়ে, যযাতি বামুনের মেয়েকেও বিয়ে করেছিল, আবার দৈত্যের মেয়েকেও বিয়ে করেছিল। তবে শুক্রাচার্য যখন দেবযানীর সঙ্গে যযাতির বিয়ে দিয়েছিল, তখন শর্ত করিয়ে নিয়েছিল যে যযাতি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে না । কিন্তু ঋতুকাল উপস্থিত হলে, শর্মিষ্ঠার অনুনয়-বিনয়ে ও দেবযানীর অজ্ঞাতে যযাতি শর্মিষ্ঠার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন । দেবযানী পিতা শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে স্বামী ও শমিষ্ঠার বিরুদ্ধে নালিশ করে। শুক্রাচার্য যযাতিকে দুর্জয় জরাগ্রস্ত হবার অভিশাপ দেন। তবে যযাতির অনুনয়ে বলেন যে যযাতি অন্যের দেহে নিজের জরা সংক্রামিত করতে পারবে । যযাতি পুত্রদের তার জরা গ্রহণ

করতে বলেন। দেবযানীর গর্ভজাত দুইপুত্র ও শমিষ্ঠার গর্ভজাত প্রথম দুইপুত্র জরা গ্রহণে অস্বীকার করে। মাত্র শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু জরা গ্রহণ করে পিতাকে তার যৌবন দেয়। এক হাজার বৎসর ইন্দ্রিয় সম্ভোগের পর যযাতি পুরুকে আবার তার যৌবন ফিরিয়ে দেয় । তারপর কঠোর তপস্যা করে যযাতি স্বর্গ লাভ করে, কিন্তু নিজেকে অতি ধার্মিক মনে করায়, ইন্দ্র তাঁকে স্বর্গভ্রষ্ট করে অন্তরীক্ষে ফেলে দেন। যযাতির দৌহিত্ররা মাতামহের এই অবস্থা দেখে তঁদের পুণ্যবলে তাঁকে আবার স্বর্গে পাঠিয়ে দেয়।

যযাতির যে দৌহিত্রদের কথা বললাম, তারা হচ্ছে যযাতির মেয়ে মাধবীর পুত্রগণ । মাধবীর উপাখ্যান মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে আছে। একবার বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালব বিশ্বামিত্রকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে বিশ্বামিত্র বলেন, তিনি চাঁদের মত শুভ্র এক কন্যা ও আটশত অশ্ব গুরুদক্ষিণা চান । গালব বিপদে পড়ে, রাজা যযাতির কাছে যায় । যযাতি তাঁর মেয়ে মাধবীকে গালবের হাতে দিয়ে বলেন যে অন্যান্য রাজারা এই মেয়ের শুদ্ধস্বরূপ গালবকে আটশত অশ্বদান করবেন । গালব মাধবীকে নিয়ে প্রথমে অযোধ্যার রাজা হর্যশ্বের কাছে যান । হর্যশ্ব মাধবীর গর্ভে বংশুমনা নামে এক পুত্র উৎপাদন করে গালবকে দুইশত অশ্ব দেন । এক ব্রহ্মজ্ঞ মুনির বরে মাধবীর কুমারীত্ব বজায় থাকে । তারপর গালব যথাক্রমে মাধবীকে কাশীরাজ দিবোদাস ও ভোজরাজ উশীনরের কাছে নিয়ে যায়। তাঁরা মাধবীর গর্ভে যথাক্রমে প্রতদাি‍ন ও শিবি-কে উৎপাদন করেন ও গালবকে প্রত্যেকে দুইশত অশ্ব দেন। পরে আর অশ্ব পাওয়া না যাওয়ায় গালব বিশ্বামিত্রকে ছয়শত অশ্ব ও মাধবীকে দান করেন। বিশ্বামিত্রের ঔরসে মাধবীর অষ্টক

নামে এক পুত্র হয়। বিশ্বামিত্র তাকেই ধর্ম, অর্থ ও অশ্বগুলি দান করে মাধবীকে গালবের হাতে দিয়ে বনে গমন করেন । গালব মাধবীকে যযাতির হাতে ফিরিয়ে দেন। পরে যযাতি মাধবীর বিবাহের জন্য এক স্বয়ংবরা সভার আয়োজন করেন । কিন্তু মাধবী সকল রাজকে প্রত্যাখ্যান করে বনে গিয়ে ধর্মপালনে রত হয় ।

।। দশ ।।

শিবি রাজার সত্যপরায়ণতার কথা আগেই বলেছি। এখন বলিরাজার সত্যপরায়ণতার কথা কিছু বলি। বলি ছিলেন দৈত্যরাজ, হরিভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র ও বিরোচনের পুত্র। নিজের তপস্যার দ্বারা ও ইন্দ্রাদি দেবতাদের পরাস্ত করে বলি ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন। রাজ্যচুযত হয়ে দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়। বিষ্ণু বামণরূপে কশ্যপের পুত্র হয়ে জন্মান ও বলির যজ্ঞানুষ্ঠানে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন । বলি সম্মত হন । কিন্তু দান পাওয়া মাত্র বামণ বিশাল আকার ধারণ করে দুইপদ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য অধিকার করে, নাভি থেকে নির্গত তৃতীয় পদ রাখবার স্থান বলিকে নির্দেশ করতে বলেন । বলি তার নিজের মাথার ওপর তৃতীয় পদ রাখতে বলেন । এমন সময় পিতামহ প্রহ্লাদ সেখানে উপস্থিত হয়ে বিষ্ণুকে বলির বন্ধন মোচন করার প্রার্থনা জানায়। তার প্রার্থনায় কিষ্ণু বলির বন্ধন মোচন করে, ও তার সত্যপরায়ণতার প্রশংসা করে ও দেবতাদের দুগ্ধপ্রাপ্য রসাতলে তার স্থান করে দেন ।

।। এগার ।।

হরিশ্চন্দ্র রাজাও তার দান, ধ্যান ও সত্যপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ অনুযায়ী অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্রলাভের জন্য নরমেধ যজ্ঞ করেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণ অনুযায়ী রাজা হরিশ্চন্দ্র একদিন মৃগয়ায় বেরিয়ে বনমধ্যে বিশ্বামিত্র মুনির তপস্যার বিঘ্ন ঘটান । তাঁর কৃতকর্মের জন্য বিশ্বামিত্র তার কাছ থেকে দান চাইলেন । বিশ্বামিত্র তার কাছ থেকে দান হিসাবে সোনাদান রাজ্য প্রভৃতি সবই আদায় করে নিলেন । অবশিষ্ট রইল মাত্র তার পরিধেয় বস্ত্র ও স্ত্রী শৈব্যা ও পুত্র রোহিত। কিন্তু বিশ্বামিত্র দক্ষিণা চাইলে, তাঁর আর কিছু না থাকায় তিনি এক ব্রাহ্মণের কাছে স্ত্রী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতকে বিক্রয় করে দিলেন । পরে তিনি নিজেকেও এক চণ্ডালের কাছে দাসরূপে বিক্রয় করে দিলেন । প্রাপ্ত অর্থ তিনি দক্ষিণাস্বরূপ বিশ্বামিত্রকে দিলেন । চণ্ডালের দাস রূপে হরিশচন্দ্র শ্মশানে কাজ করতে লাগলেন। এক বছর পরে সর্পাঘাতে রোহিতের মৃত্যু হয় । দাহের জন্য শৈব্যা মৃত পুত্রকে শ্মশানে নিয়ে আসে। সেখানে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা পরস্পরকে চিনতে পারে। তখন তাঁরা স্থির করেন, মৃতপুত্রের চিতায় দুজনেই প্রাণ বিসর্জন দেবেন। এই সময় দেবতাগণ ও ধর্ম বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হন । হরিশচন্দ্রকে তাঁরা সহমৃত হতে নিষেধ করেন। তাঁরা তাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে চান । হরিশ্চন্দ্র বলে সে তাঁর প্রভু চণ্ডালের বিনা অনুমতিতে স্বর্গে যেতে পারেন না। তখন চণ্ডাল বলে, তিনিই ধর্ম । রোহিত প্রাণ ফিরে পায় । তখন হরিশ্চন্দ্র রোহিতকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে স্বর্গে যান। সেখানে নারদের প্ররোচনায় তিনি আত্মপ্রশংসায় রত হন । এর জন্য স্বর্গ থেকে তাঁর পতন ঘটে। কিন্তু পতনের সময় তিনি অনুতপ্ত

হওয়ায়, দেবতারা তাঁকে ক্ষমা করেন, কিন্তু তাঁকে অন্তরীক্ষে এক বায়বীয় স্থানে বাস করতে হয়।

।। বার ।।

ত্রেতাযুগে স্ত্রী পুরুষ হত, এবং পুরুষ স্ত্রী হত । এই রূপান্তরের কথা রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে । বাল্হীক দেশে কর্দম রাজার 'ইল' নামে এক পুত্র ছিল। একদিন মৃগয়া করতে তিনি কার্তিকের জন্ম স্থানে এসে উপস্থিত হন । সেখানে মহাদেব স্ত্রীরূপ ধারণ করে উমার মনোরঞ্জন করছিলেন । সেখানে সকল প্রাণী স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল । রাজা ইলও অনুচরবর্গসহ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হলেন । তখন তিনি মহাদেব ও উমার শরণাপন্ন হন । তাদের প্রসন্ন করাতে তিনি বর পেলেন যে তিনি একমাস পুরুষ হবেন, আবার একমাস স্ত্রী হবেন । প্রথম মাসে রাজা ইল লোকসুন্দরী নারী হয়ে স্ত্রীভাবাপন্ন অনুচরদের সঙ্গে সেই কাননে বেড়াতে লাগলেন। চন্দ্রের পুত্র বুধ সেখানে তপস্যা করছিল। বুধ সেই সুন্দরী ললনাকে দেখে কামবাণে বিদ্ধ হল এবং তাকে বলল 'আমি ভগবান চন্দ্রের প্রিয় পুত্র, তুমি আমাকে ভজনা কর।' 'ভেজস্ব মাং বরারোহে ভক্ত্যা স্নিগ্ধেন চক্ষুসা।' (উত্তরকাণ্ড ১০২।৪) । তখন বুধ ইলর সহিত রমণে প্রবৃত্ত হল । এই ভাবে ইল এক মাস স্ত্রী হয়ে বুধের কামবাসনা পূর্ণ করতেন, এবং একমাস পুরুষ হয়ে ধর্মচর্চায় নিযুক্ত হতেন । এইরূপে আট মাস। গত হলে নবম মাসে ইল পুরুরবা নামে এক পুত্র প্রসব করলেন । পুত্রকে বুধের হতে দিয়ে, ইল অশ্বমেধ যজ্ঞ করল ও মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে পুরুষত্ব পেল ।

।। তের ।।

যোগনিরত ব্রহ্মার চক্ষু থেকে নির্গত অশ্রুবিন্দু হতে এক বানরের জন্ম হয়। তার নাম ঋক্ষরজা । এক দিন তিনি সুমেরু পর্বতে এক সরোবরতীরে বসে জলমধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পান, এবং তাকে শত্রু মনে করে তিনি জলে পড়েন ও আবার জল থেকে ওঠেন । অবগাহনের ফলে তিনি এক পরমা সুন্দরী নারীরূপ পান । সেই অনিন্দ্যসুন্দরী বরাঙ্গনাকে দেখে ইন্দ্র ও সূর্য দুজনেই কামবশে পীড়িত হন । ইন্দ্রের বীর্য ঋক্ষরজার বালে (কেশে) পতিত হয়, এবং সেই বীর্য থেকে উৎপন্ন পুত্রের নাম হয় বালী, আর সূর্যদেবের বীর্য পতিত হয় ঋক্ষরজার গ্রীবায় এবং সে বীর্য থেকে উৎপন্ন পুত্রের নাম হয় সুগ্রীব । বানররূপ ফিরে পেয়ে ঋক্ষরজা। তার দুই পুত্রকে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে যায়। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে এক দেবদূতের সাহায্যে তাদের কিষ্কিন্ধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত করবার জন্য পাঠিয়ে দেন । ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঋক্ষরজা পৃথিবীর সমস্ত বানরকুলের অধিপতি হন।

বলপূর্বক নারীধর্ষণের অনেক দৃষ্টান্ত আগে দিয়েছি। এখানে আর একটা দৃষ্টান্ত দিব । রাজা ইক্ষাকুর একশত পুত্র ছিল । কনিষ্ঠের নাম দণ্ড । দণ্ড অতিশয় মূঢ় ও মুর্খ ছিল । রাজা তার আচরণে রুষ্ট হয়ে তাকে বিন্ধ্য ও শৈবাল পর্বতের মধ্যে এক রাজ্য দিলেন । দণ্ড সেখানে মধুমন্ত নামে এক নগর স্থাপন করে শুক্রাচার্যের সাহায্যে রাজত্ব করতে লাগলেন । একদা চৈত্রমাসে মহর্ষি শুক্রাচার্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁর অসামান্য রূপবতী

কন্যা অরজাকে দেখে কামাতুর হয়ে বলপূর্বক তাকে স্পর্শ করতে যায়। অরজা বলে 'আমি আমার পিতার অধীনা । যদি আপনি আমার প্রতি আসক্ত হয়ে থাকেন, তবে আপনি আমার পিতার নিকট আমার পাণি প্রার্থনা করুন ।' দণ্ড কামশরে জর্জরিত হয়ে বলে–'তোমার জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আমি এক মূহুর্তও অপেক্ষা করতে পারছি না।' এই বলে দণ্ড অরজাকে বাহুযুগল দ্বারা বলপূর্বক ধারণ করে মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়। শুক্রাচার্য আশ্রমে ফিরে এসে কন্যার কাছে সব কথা শুনে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে দণ্ডকে অভিশাপ দেন যে সাতদিনের মধ্যে প্রজাসমেত তার সমস্ত রাজ্য ধূলিসাৎ হবে । বিন্ধ্য ও শৈবল পর্বতের মধ্যবর্তী ভূভাগ দণ্ডরাজ্য দণ্ডের অপরাধে শাপগ্রস্ত হয়ে এর নাম হয়েছে 'দণ্ডকারণ্য' তৎপর তপস্বীগণ এখানে বাস করেন, সেজন্য এর নাম হয় 'জনস্থান'

।। চোদ্দ ।।

শিবের বীর্যতেজের কথা রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৩৫-৩৭ সর্গে বিবৃত হয়েছে। সেই কাহিনী অনুযায়ী হিমবান পত্নী মেনকার গর্ভে দুই কন্যা রত্ন লাভ করেন। — (১) গঙ্গ ও (২) উমা। দেবগণের অনুরোধে গঙ্গাকে তিনি দেবগণকে প্রদান করেন। তাঁরা গঙ্গাকে নিয়ে প্রস্থান করেন, তারপর হিমবান কনিষ্ঠা কন্যা তপস্বিনী উমাকে রুদ্রহস্তে সমর্পণ করেন। মহাদেব বিবাহান্তে উমার সহিত রতিক্রিয়া করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রতিক্রিয়া করতে করতে দেবপরিমিত শতবর্ষ বিগত হলেও সেই দেবীতে কোন পুত্রোৎপাদন হল না (অর্থাৎ শুক্রক্ষরণ হল না)। তখন তখন পিতামহ দেবগণসহ 'এই বীর্যে যে পুত্রোৎপাদন হবে, তা কে ধারণ করবে ?' এরূপ বিচার করে মহাদেবের নিকট

গমন করে প্রণিপাতপূর্বক বললেন, ‘দেবাদিদেব ! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ! এই সকল লোক আপনার তেজধারণে সমর্থ নয় ; আপনি ব্রাহ্মতপোযুক্ত হয়ে দেবীর সহিত তপস্যা করে ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য তেজধারণ করুন এবং সমস্ত লোক রক্ষা করুন ।’ তখন মহাদেব বললেন, ‘সুরগণ ! আমি উমার সহিত স্বীয় তেজেই তেজধারণ করব, তোমরা ও পৃথিবী সকলেই শান্তিলাভ কর। কিন্তু আমার যে অনুত্তম তেজ স্বস্থান হতে বিচলিত হয়েছে তা কে ধারণ করবে, তা নির্দেশ কর ।’ তখণ দেবতারা বললেন, ‘আপনার যে তেজ ক্ষুব্ধ হয়েছে, পৃথিবী তা ধারণ করবে।’ তারপর মহাদেব বীর্যত্যাগ করলেন, এবং সেই বীর্যের তেজে পৃথিবী, কানন ও গিরি পরিব্যাপ্ত হল । তখন দেবগণের অনুরোধে অগ্নিদেব পবনদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই রুদ্র-তেজে প্রবেশ করলেন, এবং সেই তেজ অগ্নি কর্তৃক ব্যাপ্ত হয়ে পর্বত রূপে পরিণত হ’ল । সেই পর্বতে এক শরবন সৃষ্ট হল । সেই শরবনে কার্তিকের জন্ম হল ।

।। পনেরো ।।

মনে হয়, মহিষমর্দিনীর উপাখ্যানের সঙ্গে পাঠকরা পরিচিত । রম্ভ নামে এক দুর্দান্ত অসুর মহাদেবকে তপস্যায় প্রীত করে, মহাদেবের বরে এক ত্রিলোক বিজয়ী পুত্র পায় । সেই পুত্রই মহিষাসুর। ব্রহ্মার বরে সে পুরুষের অবধ্য হয় । মহিষাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়। অবধ্য জেনে বিষ্ণু দেবতাদের নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়ে, সম্মিলিত তেজ থেকে এক অপূর্ব লাবন্যময়ী নারীদেবতা সৃষ্টি করতে বলেন । তাঁরই হাতে মহিষাসুরের মৃত্যু ঘটবে। মহিষাসুরের তিনবার আবির্ভাব

ঘটেছিল এবং তিনবারই দেবী ত্রিবিধিরূপ ধারণ করে তাকে বধ করেন। প্রথমবার দেবী উপচণ্ডী, দ্বিতীয়বারে ভদ্রকালী ও তৃতীয়বারে দূর্গারূপ ধারণ করেন । এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন বিবরণ আছে।

।। ষোল ।।

এবার দুই দেবতা সূর্য ও বিষ্ণুর সারথিদের সম্বন্ধে কিছু বলব। সূর্যের সারথি অরুণ ও বিষ্ণুর সারথি গরুড় । অরুণ ও গরুড়ের উৎপত্তি মহাভারতের আদিপর্বে বিবৃত আছে। ঋগ্বেদে আছে ব্রহ্মার লোম হতে বালখিল্য নামে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ যাট হাজার ঋষির জন্ম হয় । বালখিল্য ঋষিরা যজ্ঞের জন্য কাঠ আনবার জন্য নিযুক্ত হয় । তারা সকলে মিলিতভাবে মাত্র একটি পত্র বহন করে আনবার সময় জলপূর্ণ এক গোস্পদের মধ্যে পড়ে যায় । এই দেখে ইন্দ্র তাদের উপহাস করে । বালখিল্য ঋষির ইন্দ্রের চেয়েও বলশালী অপর ইন্দ্র কশ্যপের শরণাপন্ন হয় । কশ্যপ বালখিল্য ঋষিদের বলেন যে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং অপর এক ইন্দ্র সৃষ্টি করলে ব্রহ্মার অপমান করা হবে । তবে তাদের মহাযজ্ঞের ফলে ইন্দ্রের পরিবর্তে এক পক্ষিশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করবে। কাশ্যপের স্ত্রী বিনতা ঋতুস্নান করে তাঁর কাছে এলে, তিনি স্ত্রীর মনোবাসনা পূর্ণ করে বলেন যে বালখিল্য ঋষিদের যজ্ঞের ফলে তার গর্ভে দুই বীরপুত্র জন্ম গ্রহণ করবে এবং তারা সমস্ত পক্ষীজাতির ওপর ইন্দ্রত্ব করবে। এই দুই বীরপুত্রের নামই অরুণ ও গরুড় ।

এই সকল পৌরানিক উপাখ্যানের নৃতাত্ত্বিক ভাষ্যের প্রয়োজন আছে । তবে তা গবেষণা সাপেক্ষ ।